রস-চিকিৎসা

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল
রাজবৈদ্য
কবিরাজ—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম, এ,
জ্যোতিভূর্ষণ, ভিষগাচার্য্য
কর্ত্তৃক প্রণীত।

মূল্য—১।০

প্রকাশক :—
শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়।
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীরাম প্রেস হইতে
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

—:—:০:—:—

যাহাতে আমি লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতে পারি তাহার জন্য যিনি চিরকাল আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন ও নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন এবং যাঁহার আগ্রহাতিশয্য না থাকিলে আমি কখনও বিদ্যাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিতাম না, ভূলোকে সাক্ষাৎ ভগবান স্বরূপ মদীয় পরমারাধ্য পিতৃদেব পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায়** মহাশয়ের শ্রীচরণাম্বুজে মল্লিখিত "**রসচিকিৎসা**" নামক গ্রন্থ ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

রাজবৈদ্য
কবিরাজ—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম, এ,
জ্যোতির্ভূষণ, ভিষগাচার্য্য

নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় ॥

মুখবন্ধ।

জগদীশ্বরের কৃপায় 'রস-চিকিৎসা' প্রকাশিত হইল। ইহা প্রকাশ করিতে বহু বাধা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রেস-বিভ্রাট না ঘটিলে অন্ততঃ আরও ৬ মাস পূর্ব্বে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিতাম। 'রস-চিকিৎসা' বঙ্গভাষায় রচিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ। হিন্দু-রসায়ন-শাস্ত্রের এতাদৃশ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে কখনও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। "রসচিকিৎসা" ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। বৈদিক যুগ হইতে রস-চিকিৎসা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধযুগে রস-বিদ্যা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। বৌদ্ধজ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-রসায়ন-শাস্ত্র ক্রমশঃ অবনতির পথে ধাবিত হইতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অবনতির চরমসীমায় আসিয়া উপনীত হয়। বড়ই সুখের বিষয় বর্ত্তমান সুধীসমাজ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সুচারুরূপে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এই বিদ্যালয়গুলিতে রস-বিদ্যা শিক্ষা দিবার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। পূর্ণাঙ্গ রসশাস্ত্র শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকও লিখিত হয় নাই। যে সকল পুস্তক বর্ত্তমান সময়ে বাজারে প্রচলিত আছে, তাহাতে রস-সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হয় নাই। রসচিকিৎসায় পারদ-ভস্ম সর্ব্বপ্রধান দ্রব্য। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে প্রচলিত রসগ্রন্থে পারদভস্মের শাস্ত্রীয় বিধি নিয়মিত ভাবে লিখিত হয় নাই। পারদভস্ম ব্যতিরেকে স্বর্ণ লৌহাদি ধাতুসকল যথার্থরূপে ভস্মীভূত হয় না। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ের রোগীগণ ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া প্রকৃষ্ট ফল

প্রাপ্ত হন না। হিন্দুরসায়ন-শাস্ত্রের বহুল প্রচার এবং উক্ত অভাবসকল দূর করিবার নিমিত্ত এই 'রস-চিকিৎসা' প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভারতীয় লুপ্তপ্রায় রসায়নশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাতে যাবতীয় রস, উপরস,ধাতু,উপধাতু, রত্ন,উপরত্ন, বিষ উপবিষ প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কি প্রকারে সহজে পারদভস্ম, হরিতাল ভস্ম প্রভৃতি তান্ত্রিক মহৌষধগুলি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা লিখিত হইয়াছে। কি প্রকারে মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে স্বর্ণ পারদের সহিত নিঃশেষরূপে মিশ্রিত হইতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে। কি প্রকারে বিনা অগ্নিযোগে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পিতল, কাংস্য, বঙ্গ, দস্তা প্রভৃতি ধাতু সকলের নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হইতে পারে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে তাম্র, রৌপ্য, প্রভৃতি ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় রত্নশাস্ত্রের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। পারদের অষ্টাদশ সংস্কার হিন্দু-রসায়ন-শাস্ত্রের পরম গৌরবের বস্তু। ইহা বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট অবিদিত। আমরা এই গ্রন্থে পারদের অষ্টাদশ সংস্কার সন্নিবেশিত করিয়াছি। প্রাচীন হিন্দু-রসশালার যাবতীয় উপকরণ সমূহের বিবরণ, যন্ত্র, মূষা ও পুটের পরিচয়, রসশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চিকিৎসক, চিকিৎসার্থী ও শিক্ষার্থী সকলেই এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। এই পুস্তক পাঠ না করিলে হিন্দুরসায়ন-শাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ জানা হইবে না।

রস উপরস, ধাতু উপধাতু, রত্ন উপরত্ন, বিষ উপবিষের জারণ, মারণ, ভস্মীকরণ,দ্রাবণ ও স্বত্বপাতনের নানাপ্রকার বিধি শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রণালীগুলির মধ্যে কতকগুলি বর্ত্তমান সময়ে বহু আয়াসসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। আমরা সেই সকল প্রণালীগুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সহজসাধ্য প্রক্রিয়াগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আমরা আমাদের লিখিত প্রক্রিয়াগুলির প্রত্যেকটীই হাতে কলমে করিয়াছি। সুতরাং আমাদের লিখিত নিয়মানুসারে রসক্রিয়া সম্পাদন করিলে কোন ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। বর্ত্তমান সময়ে অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও ঝঞ্ঝাট ও সুখসাধ্য প্রণালীর অজ্ঞতা হেতু রসক্রিয়া সম্পাদন করিতে অর্থাৎ মকরধ্বজ, লৌহভস্ম, পারদভস্ম, হরিতাল-ভস্ম প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদোক্ত অত্যাবশ্যকীয় উপকরণগুলি অনেকে প্রস্তুত করিতে সাহসী হন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং মনে বিশেষ অশান্তি ভোগ করেন। ইঁহাদিগের সুবিধার জন্য আমি সহজে মকরধ্বজ ও রসসিন্দুর-পাকবিধি, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, কাংস প্রভৃতি ধাতুসকলের ভস্ম-বিধি হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার মত বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমার পুস্তক পাঠ করিয়াও যিনি মল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসারে রসক্রিয়া করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট আসিলে আমি সযত্নে তাঁহাকে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিব।

এই পুস্তক প্রণয়ন কালে আমি যখন পারদের অষ্টাদশ সংস্কার সম্বন্ধে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের রসশালায় হাতে কলমে অনুশীলন করিতেছিলাম তখন মদীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীমান রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পি, এইচ, ডি, ভিষগাচার্য্য আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। মদীয় ছাত্র কবিরাজ শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণ সান্যাল বি,এ,কবিরাজ শ্রীমান্ সত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কবিরাজ শ্রীমান্ ব্রজভূষণ বসু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীমান্ কমলাকান্ত আচার্য্য, কবিরাজ শ্রীমান্ মনোরঞ্জন সেন গুপ্ত, শ্রীমান্ সুবোধ কান্ত নন্দী, কবিরাজ শ্রীমান্ শিশির কুমার রায় চৌধুরী এম-এ, শ্রীমান্ মণীন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী; শ্রীমান্ শ্রীপতি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এস্, সি, শ্রীমান্ দেবেন্দ্র নাথ দত্ত

ও শ্রীমান্ বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রেস-বিভ্রাটবশতঃ দুইবার এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপির অনেক অংশ নষ্ট হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রে মদীয় সুযোগ্য ছাত্র কবিরাজ শ্রীমান্ নৃপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ভিষগ্ ভূষণ আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। ঐ সাহায্য না পাইলে আমি এতশীঘ্র রস-চিকিৎসার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক মদীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ-তুল্য স্নেহশীল শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম-এ ও প্রবোধ মেমোরিয়াল উচ্চ ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়দ্বয় এই পুস্তকের প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চরণ মিত্র এম, বি, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন মদীয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দে, শ্রীযুক্ত শিশির কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেশ্বর দাস এম, এ, শ্রীযুক্ত অধর নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দে মহাশয়গণ এই পুস্তক প্রণয়ন কালে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তকখানি নির্ভুল করিয়া ছাপিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ির জন্য অনেকগুলি মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি সহৃদয় সুধীবৃন্দ তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে উক্ত প্রমাদগুলি সংশোধন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১০ই আশ্বিন সন ১৩৩৮ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম মূল-সূত্রগুলি বৈদিকযুগে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সামরিক শল্য-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধানানুযায়ী নগর নির্ম্মাণ, রোগবীজানুতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের বহু সূক্ষ্মতত্ত্ব অতি প্রাচীন বেদসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তত্ত্বগুলি ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হওয়ার পর আরব দেশে প্রচারিত হয়। আরব হইতে গ্রীস্, গ্রীস্ হইতে রোম, রোম হইতে সমগ্র ইউরোপ এবং পরে পৃথিবীর চতুষ্খণ্ডে উহা প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে সমস্ত বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগতে সম্মানার্হ হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদ তাহার কোন অংশে পশ্চাদ্পদ নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় ভৈষজ্য-ভাণ্ডার, আয়ুর্ব্বেদীয় রসচিকিৎসা জগতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অতুল্য এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বপ্রকার ধাতু, উপধাতু, রস, উপরস, রত্ন, উপরত্ন, বিষ, উপবিষ সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষেই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বৈদিকযুগের পর বৌদ্ধযুগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান—বিশেষতঃ রসবিদ্যা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল।

রসবিদ্যা ত্রিধা প্রোক্তা ধাতুবাদশ্চিকিৎসিতম্।
দুর্ল্লভা ক্ষেমবিদ্যা চ সর্ব্ববিদ্যাসু তা নরাঃ॥
চিকিৎসা দ্বিতয়া জ্ঞেয়া ব্যাধীনাং জরসস্তথা।
জরাব্যাধিবিনাশিনী চিকিৎসা হি রসায়নম্॥

অর্থাৎ রসবিদ্যা তিন প্রকার ক্ষেমবিদ্যা, রসচিকিৎসাও ধাতুবিদ্যা। ইহার মধ্যে রসচিকিৎসা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—রোগচিকিৎসা ও রসায়ন-চিকিৎসা। বৌদ্ধযুগে রসবিদ্যার এই সকল অঙ্গই পূর্ণতা প্রাপ্ত

হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দুরসায়ন-শাস্ত্রকারগণ পারদ লৌহ অভ্র সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানযুগের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এই সময়ে পারদের অষ্টাদশ সংস্কার আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কি প্রকারে স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্যাদি ধাতুসমূহ সহজে ভস্মীভূত হইয়া মানব শরীরের উপযোগী হইতে পারে, কি প্রকারে মরিচাবিহীন লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে, কি প্রকারে মকর-ধ্বজ প্রস্তুতকালে স্বর্ণ নিঃশেষরূপে পারদের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে, কি প্রকারে স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু সকলের বিনা অগ্নিসংযোগে নিরুত্থ ভস্ম হইতে পারে, এবং কি প্রকারে পারদ অন্যান্য ধাতু সকলকে গ্রাস করিতে পারে তাহার উৎকৃষ্ট পন্থা সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতির পর ভারতবর্ষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অন্ধকারের যুগ উপস্থিত হয় এবং অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ রসচিকিৎসা লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে (মৎপ্রণীত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস" নামক পুস্তকে আমি এ বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি)। বর্ত্তমান সময়ে বারাণসী, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের কোন কোন অংশে আংশিক ভাবে রসচিকিৎসা প্রচলিত থাকিলেও বিগত একশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে রসচিকিৎসা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের কবিরাজগণ রস-শাস্ত্রের যথার্থ আলোচনা করেন না। পূর্ণাঙ্গ রসশাস্ত্র শিক্ষা দিবার গুরুও দুর্ল্লভ, সকলের উপযোগী ভাল পুস্তকও লিখিত হয় নাই। যে সকল পুস্তক বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে তাহাতে রসসংস্কার সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা করা হয় নাই। রসচিকিৎসায় পারদ ভস্মই প্রধান দ্রব্য। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে প্রচলিত রসগ্রন্থে পারদ-ভস্মের শাস্ত্রীয় বিধি নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সম্যক্‌রূপে শোধিত পারদ এবং পারদ-ভস্ম ব্যতিরেকে স্বর্ণ লৌহাদি ধাতু সকল যথার্থরূপে ভস্মীভূত হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান বঙ্গীয় কবিরাজগণ অধিকাংশস্থলে রসচিকিৎসায় প্রকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হন না। কেন না—

"লৌহানাং মারণং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বেষাং রসভস্মনা।
মূলীভির্ম্ধ্যমং প্রাহুঃ কনিষ্ঠং গন্ধকাদিভিঃ॥
অরিলোহেন লৌহস্য মারণং দুর্গুণপ্রদম্॥

অপরঞ্চ

পারদেন বিনা লৌহং নিহতং জনয়েদ্ধ্রুবম্।
উদরে ভোক্তুঃ কীটানি রসজ্ঞানামিদং মতম্॥

অর্থাৎ সমুদায় ধাতুরই পারদভস্ম সংযোগে যে মারণ-ক্রিয়া সম্পাদন হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। মূলবিশেষের স্বরসাদির দ্বারা যে মারণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহা মধ্যম, আর গন্ধকাদির দ্বারা যে মারণ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে নিকৃষ্ট বলা যায়। যে ধাতুভস্ম পারদ ব্যতিরেকে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা সেবন করিলে উদরে কীট জন্মিয়া থাকে। সুতরাং রস ভস্ম ব্যতিরেকে ধাতুভস্ম ব্যবহার বিড়ম্বনা মাত্র। হরিতাল-ভস্ম, পারদ-ভস্ম সম্বন্ধে দেশে নানারূপ কুসংস্কার বর্ত্তমান আছে। অনেকের ধারণা যে হরিতাল-ভস্ম পারদ-ভস্ম প্রস্তুত করিলে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু আমরা বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে সমগ্র রসশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কোথাও সেরূপ নিষেধ-বাণী দেখিতে পাই নাই।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশক্ষেত্রে পারদভস্ম স্থলে রসসিন্দুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং লৌহভস্ম স্থলে লৌহ-চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং রোগীগণ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল পান না। আয়ুর্ব্বেদ দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমি, হাইড্রোপ্যাথি ইত্যাদি নানাপ্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি আর্য্যাবর্ত্তে প্রসিদ্ধিলাভ করিতেছে।

রসচিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ।

শাস্ত্রে কথিত আছে—

অল্পমাত্রোপযোজ্যত্বাদরুচেরপ্রসঙ্গতঃ।
ক্ষিপ্রমারোগ্যদায়িত্বাদোষধিভ্যোঽধিকো রসঃ॥
অসাধ্যা ব্যাধি যা প্রোক্তা ঔষধিভিশ্চিকিৎসয়া।
সাধ্যা সা প্রায়শো দৃষ্টা রসচিকিৎসনেন হি॥
উপরসং লুহং বিষং সসূতং রস উচ্যতে।
রসাৎ পরতরং নাস্তি ত্রিষু লোকেষু ভেষজম্॥

অর্থাৎ রস সেবনে অরুচির সম্ভাবনা নাই। অতি অল্প মাত্রায় সেবনে অতি অল্পকাল মধ্যে অধিক ফল পাওয়া যায় এবং অন্যান্য সকল প্রকার চিকিৎসা দ্বারা অসাধ্য রোগ সকল রস চিকিৎসা দ্বারা সত্বর বিনষ্ট হয় বলিয়া রসচিকিৎসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(ক) রসৌষধি সকল খুব অল্প জায়গায় অধিক রাখা চলে।

(খ) তাহাদের নষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুব কম।

(গ) যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয় না, সেই সকল ঔষধের অপচয় হইবার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা রসৌষধি যতই পুরাতন হয় ততই অধিক কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

(ঘ) রসৌষধি সেবনে অনুপানের হাঙ্গামা খুব কম।

(ঙ) রসৌষধির প্রয়োগ ব্যর্থতা অতি অল্পক্ষেত্রেই দেখা যায়।

(চ) রসৌষধি, তৈল, ঘৃত, জীব, জন্তু ও গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধ অপেক্ষা অধিক শীঘ্র কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

(ছ) রসৌষধি সকল প্রস্তুত করিতে বিশেষ হাঙ্গামার প্রয়োজন হয় না।

(জ) ইহা প্রস্তুত করিতে অধিক লোকের ও স্থানের প্রয়োজন হয় না এবং সহজে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করা চলে।

(ঝ) রসচিকিৎসায় দোষের সামতা নিরামতা, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল ইহাদের কিছুই বিচার আবশ্যক করে না।

(ঞ) গাছগাছড়ার দ্বারা রোগ চিকিৎসায় প্রত্যহই প্রভূত পরিমাণে গাছগাছড়ার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে অধিকাংশ-ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। রসচিকিৎসা-ক্ষেত্রে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোন দ্রব্যের অভাব নাই। রস-চিকিৎসার সকল উপকরণ সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তজ্জন্য রসচিকিৎসা অবলম্বনই বর্ত্তমানে সর্ব্ববিষয়ে বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে গুণগ্রাহী সুধীগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমার কার্য্যবাহুল্য ও সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটী থাকা সম্ভব। বস্তুতঃ এতাদৃশ গ্রন্থ ১ম সংস্করণে নির্দ্দোষ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। সেইজন্য সকলের নিকট আমার প্রার্থনা এই যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকালে এই গ্রন্থের যে স্থানে ত্রুটী বা দোষ পরিলক্ষিত হইবে, আমার নিকট জানাইলে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত উহা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎ সংস্করণে উহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। এই পুস্তকখানি রসচিকিৎসার বহুল প্রচারকল্পে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

বিনীত
শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

শুদ্ধি পত্র

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ
সংস্করার্থ—	৩	৫	সংস্কারার্থ।
মারিয়া—	৫	৩	মাড়িয়া।
শোষণ—	১৪	৯	শোষক !
শজিনা—	১৭	৫	সজিনা।
কাথ—	১৮	১৬	ক্বাথ।
রোগপত্তি—	২১	৮	রোগোৎপত্তির।
ঔষধ সমুহে—	২১	১৮	ঔষধ সমূহে।
মায়—	২১	২৩	যায়।
তওদ—	২১	২৫	তওদ্।
গুটিকারে—	২২	৭	গুটিকাকারে।
সংস্কারে—	৯	১২	সংস্কারে।
ভস্মত্তত্ব—	২৩	২	ভস্মত্ব।
করিান—	৩৩	২১	করিলে।
পীহা—	৪২	২১	প্লীহা।
মর্দ্দনপুক—	৪৬	৪	পূর্ব্বক।
পাষার্ণ—	৪৮	২২	পাষাণ।
লবর্ণ—	৪৯	৫	লবণ।
দেরদালী—	৫১	২০	দেবদালী।
তুরবী—	৫২	১১	তরবী।
ক্রিয়ার—	৫৪	১৭	ক্রিয়ায়।
সিন্ন—	৫৭	১৮	স্বিন্ন।
খণ্ড খণ্ড—	৫৯	১৫	খণ্ড খণ্ড।

অশুদ্ধ—	পৃষ্ঠা—	পংক্তি—	শুদ্ধ
শোষ—	৬০	৭	দোষ।
বিশু—	৬১	১৩	বিশুদ্ধ।
অমাড়িত—	৬৬	১১	অমারিত।
ধাকে	৬৬	১৬	থাকে।
রোপ্য—	৬৬	১৭	রৌপ্য।
লেহণ—	৭০	১৬	লেহন।
লেপণ—	৭২	১৪	লেপন।
লোহ—	৭৭	১৫	লৌহ।
লেপণ—	৭৯	২	লেপন।
কুষ্ট—	৯৪	৭	কুষ্ঠ।
শ্বেতকুষ্ট—	৯৪	৭	কুষ্ঠ।
বর্ত্তলোহের—	৯৫	১৫	বর্ত্তলৌহের।
বর্ত্তলোহ—	৯৫	১৮	বর্ত্তলৌহ।
এক—	৯৮	৬	ইহা এক।
রত্নশুদ্ধিঃ—	১০৩	৬	রত্নশুদ্ধি।
বিষলাহলীয়া	১০৪	১২	বিষলাঙ্গলীয়া।
স্কটিক—	১০৫	১৩	স্ফটিক।
স্কটিক—	১০৫	১৪	স্ফটিক।
সূর্ধাকান্ত—	১০৬	৪	সূর্য্যকান্ত।
তন্মুধ্যে—	১০৭	২২	তন্মধ্যে।
বীর্য্যক্ষয়—	১০৯	১৯	বীর্য্যক্ষয়।
কঞ্জি—	১১২	৬	কাঞ্জি।
বোমক—	১১৪	১০	রোমক।
কার্য্যকারী—	১১৬	১০	কার্য্যকারী।

রস-চিকিৎসা

——:০:——

জগদ্‌গুরু শ্রীহরির চরণে প্রণিপাত করিয়া চিকিৎসকগণের উপকারার্থে বিবিধ রসগ্রন্থ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া কেবলমাত্র পরীক্ষিত, প্রত্যক্ষফলপ্রদ ও সহজসাধ্য ঔষধ ও প্রস্তুত প্রণালীগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পারদ

যে পারদের অন্তর্ভাগ উৎকৃষ্ট নীলবর্ণ এবং বহির্ভাগ মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ, ঔষধকার্য্যে তাহাই প্রশস্ত। আর যাহা ধূম্র, পাণ্ডুর বা বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট তাহা রসকার্য্যে অব্যবহার্য্য।

নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি, ও অসহাগ্নি—এইগুলি পারদের স্বাভাবিক দোষ। পারদ শোধন না করিয়া ব্যবহার করিলে নাগদোষ হইতে ব্রণ, বঙ্গদোষ হইতে কুষ্ঠ, মলদোষ ও গিরিদোষ হইতে জড়তা, বহ্নিদোষ হইতে দাহ, চাঞ্চল্যদোষ হইতে বীর্য্যনাশ, বিষদোষ হইতে মৃত্যু এবং অসহাগ্নিদোষ হইতে স্ফোটরোগ জন্মে।

পর্পটী, পাটলী, ভেদী, দ্রাবী, মলকারী, অন্ধকারী ও ধ্বাংক্ষী—এই সাতটী পারদের কঞ্চুকদোষ। অশুদ্ধ পারদ ব্যবহারে পর্পটীদোষ হইতে চর্ম্মের কর্কশতা, পাটলীদোষ হইতে চর্ম্মবিদারণ (গা ফাটা), ভেদীদোষ হইতে নাড়ীব্রণ, দ্রাবীদোষ হইতে গলৎকুষ্ঠ, মলকারীদোষ হইতে ত্রিদোষবৃদ্ধি, অন্ধকারীদোষ হইতে

চক্ষুহীনতা, ধ্বাংক্ষীদোষ হইতে চর্ম্মের কৃষ্ণবর্ণতা উৎপন্ন হয়। সুতরাং চিকিৎসক মাত্রেই পারদকে শোধন করিয়া ব্যবহার করিবেন।

দোষহীন, শুদ্ধ পারদ মৃত্যু ও জরানাশক এবং সাক্ষাৎ অমৃততুল্য। অল্পমাত্র প্রয়োগেই অধিক ফল পাওয়া যায়, সেবনে অরুচির সম্ভাবনা নাই এবং শীঘ্র আরোগ্যদান করে বলিয়া পারদ অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চরকাদি চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ সাধ্যরোগেই ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পারদ সাধ্য অসাধ্য সকল রোগেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মৃত পারদ অকালবলীপলিতাদি নাশক; মূর্চ্ছিত পারদ ব্যাধিনাশক; যথারীতি বদ্ধ পারদে খেচরতা লাভ হয়। পারদ অপেক্ষা হিতকর পদার্থ আর কিছুই নাই।

ক্ষেত্রভেদে পারদ চারিপ্রকারঃ—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ পারদ রোগনাশক, রক্তবর্ণ পারদ রসায়নে, পীতবর্ণ পারদ ধাতুভস্মী করণে, কৃষ্ণবর্ণ পারদ খেচরত্ব-দানে প্রশস্ত। ইহা ছাড়া হিঙ্গুল হইতে ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রের সাহায্যে যে পারদ পাওয়া যায় তাহা অতি বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য।

পারদের অষ্টাদশ সংস্কার

(১) শোধন, (২) স্বেদন. (৩) মর্দ্দন, (৪) উদ্ধৃতি, (৫) পাতন, (৬) রোধন, (৭) নিয়ামন, (৮) দীপন, (৯) অনুবাসন, (১০) গ্রাসন, (১১) মূর্চ্ছন, (১২) সঞ্চারণ, (১৩) গর্ভদ্রুতি, (১৪) জারণ, (১৫) মারণ, (১৬) ভস্মীকরণ, (১৭) রঞ্জন ও (১৮) বেধন, এইগুলি পারদের সংস্কার। প্রথম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সংস্কার দ্বারা শোধিত পারদ ঔষধে ব্যবহার করিলে প্রকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কিন্তু কেবলমাত্র শুদ্ধ পারদই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা করা উচিত নহে। কারণ, কেবল শোধনের

দ্বারা পারদের নাগবঙ্গাদি দোষ ও কঞ্চুকদোষ নিবারিত হয় না। কিন্তু হিঙ্গুলোত্থ পারদ শোধনাদি অষ্টকর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহার্য্য।

শুভ নক্ষত্রে, সুমুহূর্ত্তে একশত, পঞ্চাশ, পঁচিশ, দশ, পাঁচ অথবা এক পল পারদ শোধনার্থ গ্রহণ করিবে। উত্তম সংস্কারার্থ একপলের ন্যূন পারদ যেন গ্রহণ না করা হয়।

১। পারদ শোধন বিধি। (১ম সংস্কার) রস মারক দ্রব্যের ষোড়শাংশ (পারদের ষোড়শাংশ) চূর্ণ দ্বারা পারদ মর্দ্দন করিবে। প্রত্যহ প্রত্যেক বস্তু দ্বারা সাতবার মর্দ্দন করিবে।

১। ঘৃতকুমারীর রস, চিতার কাথ ও কাকমাছির রস, ইহাদের প্রত্যেকের সহিত এক এক দিন মর্দ্দন করিলে পারদ দোষরহিত হয়।

২। রসোনের রস, পানের রস এবং ত্রিফলার কাথে পারদ মর্দ্দন করিবে। প্রত্যেক রসে মর্দ্দন করিবার পর প্রত্যেকবার উহা ধুইয়া লইবে। ইহাতে পারদের সকল প্রকার দোষ নষ্ট হয়।

৩। ঘৃতকুমারী, চিতা, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহাদের কাথে পারদ তিনদিন মর্দ্দিত হইলে সর্ব্বদোষবিমুক্ত হয়।

হিঙ্গুল হইতে রসাকর্ষণ বিধি।—গোঁড়া লেবু অথবা লেবুর রসে হিঙ্গুল একদিন মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিবে। বর্ত্তমান সময়ে কবিরাজগণ যে প্রচলিত প্রণালীতে ঊর্দ্ধপাতন দ্বারা পারদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য। আমরা বহু গবেষণা করিয়া নির্দ্দোষভাবে হিঙ্গুল হইতে পারদ প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী বাহির করিয়াছি, তাহা অতি সহজ সাধ্য এবং অল্পকাল সাপেক্ষ। হিঙ্গুলকে বারোঘণ্টা লেবুর রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণীকৃত হিঙ্গুলের সহিত সমপরিমাণ পাথরের

চূণ চূর্ণ করিয়া মিশাইবে। তৎপরে মিশ্রিত চূর্ণদ্বয়কে একটি মালসায় রাখিয়া তাহার উপর একটি বড় হাঁড়ি স্থাপন করিবে। হাঁড়িটির পশ্চাদ্‌ভাগে একটি বৃহৎ ছিদ্র থাকিবে, ঐ ছিদ্র মালসার মুখে বসিবে। হাঁড়ির উপর আর একটি হাঁড়ি উপুড় করিয়া বসাইতে হইবে। উক্ত তিনটি পাত্রের সংযোগস্থলগুলি মৃত্তিকা ও গোময়ের লেপ দিয়া উত্তমরূপে সংরুদ্ধ করিবে। তারপর উক্ত যন্ত্রটিকে প্রবল অগ্নিবিশিষ্ট পাথুরিয়া কয়লার চুল্লীর উপর বসাইয়া দিবে। প্রবল অগ্নির উত্তাপে হিঙ্গুল মালসা হইতে উত্থিত হইয়া ভস্মাকারে উপরিস্থ হাঁড়ির গায়ে লাগিয়া যাইবে। অগ্নির উত্তাপ কমিবার পর যন্ত্র শীতল হইলে পাত্র তিনটিকে খুলিয়া হাঁড়ির গাত্রসংলগ্ন ভস্ম সংগ্রহ করিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা ছাকিয়া লইলে সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত মধ্যাহ্ন সূর্য্যতুল্য পারদ পাওয়া যায়।

২। **পারদের স্বেদন বিধি।**—(২য় সংস্কার) ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, চিতার কল্ক কাঁজিতে নিক্ষেপ করিয়া দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিলে পারদের স্বেদন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৩। **পারদের মর্দ্দন বিধি (তৃতীয় সংস্কার)।** —ঝুল, ইষ্টকচূর্ণ, কৃষ্ণজীরা, মেষলোমভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঁজি— এই সকল দ্রব্য মিলাইয়া পারদের ষোড়শাংশ পরিমাণ লইয়া তদ্দারা উক্ত পারদ তিন দিন মর্দ্দন করিলে পারদের মর্দ্দন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৪। **পারদের উদ্ধৃতি (৪র্থ সংস্কার)।**—পারদের এক চতুর্থাংশ হরিদ্রা চূর্ণ ও ঘৃতকুমারীর রসে পারদকে মর্দ্দন করিয়া পাতন যন্ত্রে উর্দ্ধপাতন করিলে উদ্ধৃতি ক্রিয়া নামক পারদের চতুর্থসংস্কার সম্পন্ন হয়।

৫। **পারদের পাতন (৫ম সংস্কার)।**—এই পাতন তিন প্রকার, উর্দ্ধ পাতন, অধঃপাতন ও তির্য্যকৃপাতন। বিশুদ্ধ

ভাবে পাতনক্রিয়া করিতে হইলে এই তিন প্রকার ক্রিয়াই করা কর্ত্তব্য।

উর্দ্ধপাতন।—পারদকে শোধিত তাম্রের সহিত মারিয়া তিন বার উর্দ্ধপাতন করিলে পারদের উর্দ্ধপাতন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

অধঃপাতন।—পারদকে ত্রিফলা, সৈন্ধব, চিতা ও ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে অধঃপাতিত করিলে পারদের অধঃপাতন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

তির্য্যক্ পাতন।—কাঁজির সহিত শোধিত অভ্র এবং পারদ একত্র মাড়িয়া একটি তাল পাকাইয়া তির্য্যকৃপাতন যন্ত্রে পাতিত করিলে পারদের তির্য্যকৃপাতন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৬। **পারদের রোধন (নিরোধ) (৬ষ্ঠ সংস্কার)।**—বিকশিত পদ্ম মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলে পারদের নিরোধ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। স্বেদনাদি হেতু হীনশক্তি পারদ নিরোধ ক্রিয়া দ্বারা উৎকৃষ্ট বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৭। **পারদের নিয়ামন (৭ম সংস্কার)।**— নিরোধ ক্রিয়ার পর পারদের চপলতা নিবৃত্তির জন্য নিয়ামন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কাঁকরোল, সর্পাক্ষী পদ্ম ও ভৃঙ্গরাজ দ্বারা কাঁজির সহিত তিন দিন স্বিন্ন করিলে পারদের নিয়ামন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা পারদ গ্রাসার্থী হইয়া থাকে।

৮। **পারদের দীপন (৮ম সংস্কার)।**—যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, ভূনাগ, সজিনা, রাই সর্ষপ, অম্লবেতস, মরিচ ও কাঁজি—এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া নেপাল দেশীয় তাম্রপাত্রে শুষ্ক করিবে। তৎপরে পুনরায় কাঁজি দ্বারা দোলা যন্ত্রে স্বিন্ন করিলে পারদের দীপন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৯। পারদের অনুবাসন (৯ম সংস্কার)।—প্রস্তর পাত্রে লেবুর রস রাখিয়া তন্মধ্যে পারদ নিক্ষেপ করিয়া একদিন রৌদ্রে উত্তপ্ত করিলে পারদের অনুবাসন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১০। পারদের গ্রাসন (ধাতু ভোজন) ১০ম সংস্কার)।—একটি বাজ (সিজ) বৃক্ষের শাখায় অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে পারদ পূরিয়া মৃত্তিকা লেপ দিয়া তিনদিন ঘুটের আগুনে পাক করিলে পারদের গন্ধক, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু গ্রাসন শক্তি জন্মে।

১১। পারদের মূর্চ্ছন (১১শ সংস্কার)।

(ক) এক ভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিলে পারদের মূর্চ্ছনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এইরূপে মূর্চ্ছিত পারদ দ্বারা অনুপানভেদে সর্ব্বপ্রকার রোগ নিরাকৃত হয়।

(খ) **রসসিন্দুর।**—একভাগ পারদ, তিনভাগ গন্ধক এবং পারদের অষ্টমাংশ সীসক ভস্ম একত্র কজ্জলী করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে যে রসসিন্দুর প্রস্তুত হয়, তাহা অনুপানভেদে সর্ব্বরোগ নাশক এবং জরা মৃত্যু নাশক।

(গ) **শ্বেতরস অথবা কর্পূর রস।**—একভাগ পারদ একভাগ সোহাগা, একভাগ মধু, একভাগ লাক্ষা একভাগ গুঞ্জা ভৃঙ্গরাজ-রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে কর্পূর সদৃশ যে রস পাওয়া যায় তাহার নাম কর্পূররস। ইহাও অনুপান ভেদে সর্ব্বরোগ নাশক।

(ঘ) **সিন্দুররস।**—পারদ একভাগ, গন্ধক অর্দ্ধেক ভাগ বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে বোতলের গলদেশে যে সিন্দূর সদৃশ রস পাওয়া যায় তাহার নাম সিন্দূররস। ইহা অনুপানভেদে সর্ব্বরোগ নাশক।

(ঙ) **পীতরস।**—পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া হাতীশুঁড়ার বা ভূঁইআমলার রসে সাতদিন মর্দ্দন করিয়া মুখাবদ্ধ করিয়া একদিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে পীতবর্ণ যে রস পাওয়া যায় তাহাকে পীতরস বলে। এই পীতরস পানের রসের সহিত একরতি পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

(চ) **কৃষ্ণরস।**—লৌহ অথবা তাম্র নির্ম্মিত পাত্রে এক পল শুদ্ধ গন্ধক রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলে তাহাতে তিনপল পারদ নিক্ষেপ করিয়া লোহার হাতার দ্বারা পুনঃ পুনঃ নাড়িবে। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গোময়ের উপর স্থাপিত একখানি কদলী-পত্রে উহা ঢালিয়া অপর একটি কদলীপত্র বেষ্টিত গোময়পোটুলীদ্বারা চাপিয়া ধরিবে। এইরূপে কৃষ্ণরস প্রস্তুত হইবে। ইহা সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

শ্বেতরস, পীতরস, সিন্দূররস বা রসসিন্দুর ও কৃষ্ণরস, এইচতুর্ব্বিধ রস যথাক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

(ছ) **রসতাল।**—শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও লাল দারমুজ, এই চারিদ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া একত্রে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে চারিপ্রহর পাক করিলে যে রস উৎপন্ন হয় তাহার নাম রসতাল। ইহা জ্বরঘ্ন, অগ্নিদীপক, বীর্য্যস্তম্ভক, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক, বলকারক, মেধাজনক ও রসায়ন। ইহা এক যব মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

(জ) **স্বর্ণসিন্দুর।**—স্বর্ণভস্ম এক পল, পারদ আট পল, গন্ধক ষোল পল একত্র ঘৃতকুমারীরসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইবে। পরে ঐ শুষ্কচূর্ণ বোতলে পূরিয়া বালুকাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিবে। বোতল শীতল হইলে রক্তবর্ণ রস সংগ্রহ করিয়া লইবে। ইহা এক যব মাত্রায় পানের রসের সহিত প্রযোজ্য। অনুপানভেদে ইহা সর্ব্বরোগ

নাশকও বটে। বিশেষতঃ ইহা জ্বর, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য নাশ করে।

১২। পারদের সঞ্চারন (১২শ সংস্কার)।—পারদ, স্বর্ণভস্ম ও লৌহভস্ম প্রত্যেক সমভাবে পুরাতন পুরাতন কাঁজি দ্বারা মর্দ্দন করিলে পারদের সঞ্চারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১৩। পারদের গর্ভদ্রুতি (১৩শ সংস্কার)—সমভাগ অভ্রসত্ত্ব ও মাক্ষিকসত্ত্ব একত্রে মিশ্রিত করিয়া দুইভাগ পারদের উপর নিক্ষিপ্ত করিলে পারদের গর্ভদ্রুতি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১৪। পারদের জারন (১৪শ সংস্কার।—এক-চতুর্থাংশ তাম্রভস্মের দ্বারা একভাগ পারদ মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ডমরু যন্ত্রে লেবুর রস পূর্ণ করিয়া উর্দ্ধপাতন করিবে। তাহার পর রক্তগণের দ্বারা মর্দ্দন করিলে পারদের জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১৫। পারদের মারন (১৫শ সংস্কর)।—পলাশ-বীজ, চন্দন ও লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে অথবা বালুকাযন্ত্রে পারদকে পাক করিলে উহার মারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মৃত পারদের লক্ষন।—মৃত পারদ শুভ্র লঘু, স্থির, চাক্‌চিক্যহীন এবং অন্য ধাতু মারণে সমর্থ।

১৬। পারদের ভস্মীকরন।—(ক) অপামার্গ তৈলের দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে পারদ ভস্মীভূত হয়।

(খ) অথবা পুষ্করমূল ও কাঁটানটের মূল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলেও পারদ ভস্মীভূত হয়।

মারন ব্যতিরেকে ভস্মীকরন বিধি।—(ক) অপামার্গবীজ ও পদ্মের কল্কের সহিত পারদকে মুষাবদ্ধ করিয়া পুটপাক করিলে মারণ ব্যতিরেকেও পারদ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

(খ) অথবা পারদ ও অভ্র সমভাগে বটের আঠায় তিনপ্রহর মর্দ্দন করিয়া কোষ্ঠিকাযন্ত্রে পুটপাক করিলে পারদ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ভস্মীভুত পারদের লক্ষন।—ভস্মীভূত পারদ চাক্‌চিক্যহীন স্থির, লঘু, শ্বেতবর্ণ, অন্য ধাতু মারণে সমর্থ এবং উর্দ্ধ-পাতনের অযোগ্য।

১৭। পারদের রঞ্জন (১৭শ সংস্কর)।—গন্ধক সংযোগে জারিত সীসককে পুনরায় তাম্রের দ্বারা জারণ করিতে হইবে। এইরূপে জারিত তিনভাগ তাম্রের দ্বারা মারিত হইলে পারদ লাক্ষা সদৃশ বর্ণ ধারণ করে।

১৮। পারদের বেধন (১৮শ সংস্কার)।—পারদের বেধনকার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে পারদের রঞ্জন, পরে জারণ, এবং তৎপরে পুনরায় রঞ্জন ও জারণ করিতে হইবে। এইরূপে রঞ্জন ও জারণ ক্রিয়া সাতবার করা হইলে পারদের বেধন সমাপ্ত হইবে।

এবংবিধ পারদ অন্য সকল ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। চিকিৎসাক্ষেত্রে কিন্তু পারদের রঞ্জন ও বেধনক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র ভস্মীভূত পারদই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পারদভস্মের অনুপান।

শ্বাস, কাস ও শূলে—পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, ভার্গী এবং মধু।
রক্তদুষ্টিতে—হলুদ ও চিনি কিংবা মধু।
পাণ্ডু ও কামলায়—ত্রিকটু, ত্রিফলা ও বাসকের ক্বাথ কিম্বা যষ্টিমধু।
মূত্রকৃচ্ছ্রে—শিলাজতু, এলাইচ ও মিশ্রী অথবা গোক্ষুররস ও দুগ্ধ।
ধাতুদৌর্ব্বল্যে—লবঙ্গ এবং পানের রস।

জ্বরে (যে কোন প্রকার)—সৌবর্চ্চল লবণ, লবঙ্গ, ভূনিম্ব এবং হরীতকী। কিম্বা লেবুর রস।

কোষ্ঠবদ্ধতায়—সৌবর্চ্চল লবণ এবং ত্রিফলা।

বমিতে—সিদ্ধি ও যমানী কিম্বা মধু, খই, চিনি ও মুদগযুষ।

সর্ব্বপ্রকার উদর রোগে—সৌবর্চ্চল লবণ, হলুদ, সিদ্ধি ও যমানী।

ক্রিমি রোগে—হলুদ বা আনারসের পাতার রস।

অতীসারে—অহিফেন, লবঙ্গ, হিঙ্গুল এবং সিদ্ধি।

অগ্নিমান্দ্যে—সৌবর্চ্চল লবণ ও যমানী।

সর্ব্বপ্রকার পিত্তবিকারে—আমলকী ও চিনি।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুবিকারে—পিপুল।

সর্ব্বপ্রকার কফবিকারে—আদার রস।

ত্রিদোষজ জ্বরে—দশমূল পাচন ও পিপুলচূর্ণ।

রক্তপিত্তে—হরীতকীচূর্ণ ও মধু কিংবা পিপুলচূর্ণ ও বাসকের ক্বাথ।

ক্ষয়কাসে—ঘৃত ও ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ পিপুলচূর্ণ অথবা ত্রিফলা, গন্ধক, ত্রিকটু ও পুরাতন গুড়।

হিক্কায়—সৌবর্চ্চল লবণ, বীজপুরের রস ও মধু।

অর্শে—পুটপক্ব শূরণ, তৈল ও সৈন্ধব লবণ।

বিসূচিকায়—পিপুল ও হিঙ্গু।

প্রমেহ ও শুক্রতারল্যে—শতমূলী রস বা শিমূলমূল চূর্ণ।

প্লীহা ও গুল্মে—ন্যগ্রোধাদি বা অসনাদির ক্বাথে মিশ্রিত হরীতকী, রসোন ও গোমূত্র।

পিত্তশূলে—কলায়যূষ ও শম্বুক ভস্ম।

আমশূলে—তিলক্বাথ ও ত্রিকটু।

শোথ ও পাণ্ডুরোগে—ত্রিফলার ক্বাথ।

কুষ্ঠে—পঞ্চনিম্বের ক্বাথ।

শ্বেতকুষ্ঠে—জারিত অভ্র ও ত্রিফলা।

বাতরক্তে—গুলঞ্চ, হরীতকী ও গুড়।

গৃধ্রসী— শুঁঠচূর্ণ ও এরণ্ডমূলসহ সিদ্ধ দুগ্ধ।

মেদরোগে—মধু ও জল।

কার্শ্যরোগে—চিনি।

উন্মাদ—ও অপস্মারে—ঘৃত, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল লবণ, ত্রিকটু ও গোমূত্র।

দুষ্টব্রণে—ত্রিফলা, পটোলমূল, ত্রিকটু, গুগ্গুলু, গুলঞ্চ ও বিড়ঙ্গ।

গলগণ্ডে—মূলার রস, ত্রিফলা, পটোলমূল, ত্রিকটু, গুগ্গুলু, গুলঞ্চ ও বিড়ঙ্গের লেপ।

মসূরিকা—নারিকেল জল।

বিষদোষে—তৈল, কার্পাসপত্র ও অনন্তমূলের ক্বাথ। অথবা চাউল-ধোয়া জল ও কাঁটানটের রস অথবা কর্পূর, দধি ও গোময়রস।

রসায়নে—ত্রিফলা চূর্ণ ও স্বর্ণভস্ম।

বাজীকরণে—ত্রিফলা চূর্ণ, স্বর্ণভস্ম ও লৌহভস্ম কিংবা ঘৃত, মধু, শতমূলী রস ও দুগ্ধ কিংবা জারিত স্বর্ণমাক্ষিক ও মধু কিংবা অভ্রভস্ম, ও বকফুলের রস ও কাঁচকলার রস।

রস-সেবনবিধি

পারদ ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে একদিন প্রাতে বিরেচন গ্রহণ করিবে এবং সেই দিবস উপবাস করিয়া থাকিবে। রাত্রিতে অল্প কিছু আহার করিতে পারা যায়। বিরেচন-জনিত দুর্ব্বলতা অপগত হইলে পারদ সেবন আরম্ভ করিবে। মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের পক্ষে এক রতি।

পারদ সেবনকালে কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে শয়নের পূর্ব্বে পিপুল ও গুলঞ্চের ক্বাথ সেবন করা কর্ত্তব্য। পারদভস্ম পানের রসের সহিত সেবিত হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা নাশ করে।

রস-সেবনে পথ্যাপথ্য

মুদ্গযূষ, সৈন্ধব লবণ, পিপুল, মুথা, পদ্মমূল, গোধূম, শালিধান্য, গোদুগ্ধ, স্নান, মনোরমা স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ, ঘৃত, যব, আদা, জীরা ইত্যাদি পারদসেবীর পথ্য।

কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, তরমুজ, করলা, কুসুমশাক, কাঁকরোল, কলমী, কাকমাছি—এই আটটী পারদসেবীর অপথ্য। তৈল মর্দ্দন, কাঁজি ভক্ষণ, মদ্য, দধি, অম্লরসবিশিষ্ট দ্রব্য, রসোন, পলাণ্ডু, মূলা কলায়, বার্ত্তাকু, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, কটু, তিক্ত, লবণাক্ত, অধিক মিষ্ট, অধিক বায়ু সেবন, শৈত্যক্রিয়া, রৌদ্রসেবা, শোক তাপ, চিন্তা, সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন এবং যে সমস্ত দ্রব্য পারদ ও ধাতুসকলের মারণে সহায়তা করে তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কর্পূর, দারুচিনি, বড় এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, ত্রিকটু এবং জায়ফলও অপথ্য। অজীর্ণে ভোজন এবং ক্ষুধার বেগ ধারণ অকর্ত্তব্য।

অশোধিত পারদ সেবন জনিত বিকার নিবারণের উপায়

অশুদ্ধ পারদ সেবনে হৃদয়ে জ্বালা উপস্থিত হইলে জীরাবাটা সহ শিঙ্গি, কই, জিয়ল মাছের ঝোল, শালিধান্য এবং দুগ্ধ সেবন করিবে। বায়ু বৃদ্ধি হইলে নারায়ণ তৈল ব্যবহার্য্য। মনের চঞ্চলতায় মস্তকে শীতল জল দিবে। অত্যধিক তৃষ্ণায় ডাবের জল, মুদ্গযূষ ও চিনির সরবৎ সেব্য।

সীসক বঙ্গ মিশ্রিত পারদ ভক্ষণ করিয়া অসুস্থতা হইলে গোমূত্র ও সৈন্ধব লবণ সেবন করা উচিত।

অশুদ্ধ পারদ সেবনে শূল, নাভিশূল, তন্দ্রা, জ্বর, অরুচি, আলস্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ, শোথ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। উক্ত রোগ সকল দ্বারা আক্রান্ত হইলে সৌবর্চ্চল লবণ ও গোমূত্র তিনদিন ভক্ষণ করিবে।

অধিক অম্ল, তিক্ত কটু দ্রব্য সেবনে পারদের ক্রিয়া নষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেক কবিরাজ মকরধ্বজ বা রসসিন্দুরের সহিত কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করেন। ইহা অতিশয় গর্হিত ব্যাপার। কারণ, কুইনাইন অতিশয় তিক্ত দ্রব্য ; ইহার সহিত পারদ সেবন করিলে পারদের গুণ নষ্ট হয় এবং শরীরে বিষক্রিয়া উৎপন্ন হয়।

পারদসেবীর কখনও ক্ষুধা সহ্য করা বা উপবাস করা উচিত নয়।

অশোধিত পারদ সেবন জনিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি শোধিত গন্ধক সেবনে নষ্ট হইয়া থাকে।

অশোধিত রসকর্পূর সেবন জনিত অসুস্থতায় মিছরী সহিত ধনে-ভিজান জল সেবন করিবে।

অশোধিত পারদে প্রস্তুত রসসিন্দুর সেবনেও অশোধিত পারদ সেবনের মত বিষক্রিয়া হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে সাতদিন ধরিয়া গোলমরিচ সহ গব্যঘৃত পান করিবে।

পারদের গুণ

শোধিত এবং ভস্মীকৃত পারদ জরা মৃত্যু নাশক। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন, বল, বুদ্ধি, কান্তি ও মেধাবর্দ্ধক। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গন্ধক

গন্ধক বর্ণভেদে চারিপ্রকার, যথা—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণ। স্বর্ণসংস্কার বিষয়ে লোহিত বর্ণ, রসায়ন কার্য্যে পীতবর্ণ এবং ব্রণ বিলেপন কার্য্যে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক স্বর্ণ সংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যে প্রশস্ত। ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। পীতবর্ণ গন্ধক আমলাসার গন্ধক বলিয়া পরিচিত। ইহার অপর নাম শুকপিচ্ছ। রসক্রিয়ায় ও রসায়ন কার্য্যে এই গন্ধকই শ্রেষ্ঠ। রক্তবর্ণ গন্ধক লৌহ মারণ কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়। উহার অপর নাম শুক-চঞ্চু।

গন্ধক অতিশয় রসায়ন, মধুর রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য কণ্ডু কুষ্ঠ-বিসর্প ও দদ্রুনাশক, অগ্নিদীপ্তিকর, পাচক, আমদোষনাশক, শোষণ, বিষনাশক, পারদের বীর্য্যবর্দ্ধক, ক্রিমিনাশক এবং স্বর্ণ অপেক্ষাও অধিক গুণবিশিষ্ট।

গন্ধকের শোধনবিধি

গন্ধকে শিলাচূর্ণ এবং বিষ, এই দুই দোষ বিদ্যমান থাকে, সেইজন্য ঔষধার্থে উহাকে উত্তমরূপে শোধিত করা উচিত।

১। চূর্ণ গন্ধক গব্য ঘৃতের সহিত অগ্নিতাপে দ্রবীভূত করিয়া ঘৃতাক্ত বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং এক দণ্ডকাল গোদুগ্ধে ভিজাইয়া পরে জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত গন্ধকের পাষাণ খণ্ড সকল বস্ত্র দ্বারা দূরীভূত হয়, বিষভাগ তুষারাকারে ঘৃতের সহিত পতিত থাকে এবং বিশুদ্ধ গন্ধকভাগ পিণ্ডাকারে পরিণত হয়। শোধিত গন্ধক সেবিত হইলে অপথ্য সেবনেও কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না। কিন্তু অশোধিত গন্ধক সেবন করিলে অপথ্য সেবন দ্বারা তাহা পীত হলাহলের ন্যায় প্রাণনাশ করে।

২। গন্ধককে চূর্ণ করিয়া তিনদিন ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিবে। তাহার পর উহাকে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে একখানি হাতায়

কিঞ্চিৎ ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিতাপে ধরিবে—অগ্নিতপ্ত ঐ হাতায় গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলে একখানি ঘৃতাক্ত বস্ত্র দ্বারা একটি ভৃঙ্গরাজরসপূর্ণ ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে ঐ দ্রবীভূত গন্ধক নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে গন্ধক ভাণ্ডমধ্যে জমিয়া যাইলে উহাকে একদণ্ডকাল উক্ত রসের সহিত অগ্নিতাপে স্বিন্ন করিবে। এইরূপে শোধিত গন্ধক অতিশয় শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার পর্পটী প্রস্তুতকালে এই প্রকারে শোধিত গন্ধক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

গন্ধক সেবনবিধি

শোধিত গন্ধক ত্রিফলা চূর্ণ, ঘৃত, ভৃঙ্গরাজরস ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সিকি তোলা মাত্রায় সেবন করিলে গৃধ্রের ন্যায় দৃঢ়শক্তি হয় এবং রোগহীন দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যায়।

ত্বগ্‌দোষে—গন্ধক সিকি তোলা ও পাকা কলা।
বলক্ষয়ে—চিতামূলচূর্ণ ও মধু সহ।
অগ্নিমান্দ্যে—ত্রিফলার ক্বাথ সহ।
ক্ষয়কাসে—বাসকের ক্বাথ সহ।
ঊর্দ্ধদেহগত সর্ব্বরোগে—ঘৃত ও মধু সহ।

গন্ধক ১, মরিচ ১, ত্রিফলা ৬—একত্র করিয়া সোঁদাল মূলের রসে মাড়িয়া সেবন করিলে এবং সোঁদাল-মূলের রসে গন্ধক পেষণ করিয়া প্রত্যহ শরীরে লেপন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

বলবৃদ্ধির জন্য—দুগ্ধ সহ গন্ধক ।০ তোলা মাত্রায়
দুষ্টব্রণে—তিল তৈল সহ।
সর্ব্বরোগে—গব্যঘৃতসহ।
চক্ষুর্দোষে—সমপরিমাণ পিপ্পলী ও হরীতকীচূর্ণ সহ।

দুর্জ্জয় কণ্ডু ও পামা রোগে—১ তোলা গন্ধকচূর্ণ, তৈল, অপামার্গ রস ও মরিচের সহিত মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ।

শুক্রতারল্যে—গোদুগ্ধ, চতুর্জাত (দারুচিনি, বড় এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর)।

গণোরিয়ায়—গুরুচী, হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী, ত্রিকটু।

অক্ষুধায়, উদরাময়ে, কুষ্ঠে, শূলে —ভৃঙ্গরাজ এবং আদা ইহাদের প্রত্যেকের রসে বা ক্বাথে পৃথকভাবে বিভাবিত গন্ধক ১ তোলা মাত্রায়।

গলৎ কুষ্ঠে—গন্ধক তৈল সেবনে।

গন্ধক তৈল প্রস্তুত বিধি।

গন্ধকচূর্ণ দুগ্ধের মধ্যে ফেলিয়া কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইয়া, তদ্দ্বারা দধি প্রস্তুত করিবে। অনন্তর সেই দধি হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম গন্ধক তৈল। এই গন্ধক তৈল গাত্রে লেপন করিলে বা সেবন করিলে গলৎকুষ্ঠ নিবারিত হয়।

গন্ধক সেবীর পথ্যাপথ্য।

গন্ধক সেবী, ক্ষার দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, অধিক লবণাক্ত দ্রব্য, স্ত্রীসঙ্গ অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ, মদ্যপান, শাক ও দ্রুতযানে ভ্রমণ, দাল্ ভক্ষণ কটুদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

গন্ধকের গন্ধ দূরীকরণ।

গন্ধকচূর্ণ দুগ্ধের সহিত জ্বাল দিতে দিতে যখন উহা জমিয়া যাইবে তখন উহাকে আবার সূর্য্যাবর্ত্ত-রসে ও পরে ত্রিফলার ক্বাথে জ্বাল দিবে। এইভাবে শোধিত গন্ধকের গন্ধ নাশ হইবে।

রস-চিকিৎসা।

১। পারদের ধাতু গ্রাসনের সহজ প্রক্রিয়া ঃ নয় প্রকার বিষ ও সাত প্রকার উপবিষ দ্বারা মর্দ্দন করিলে পারদের ধাতু গ্রাসন শক্তি জন্মে।

২। ত্রিকটু ক্ষার দ্বয় রাইসর্ষপ, পঞ্চলবণ, রসুন, নিশাদল, শজিনা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ পারদের সমপরিমাণে লইয়া তৎ সমুদায় একত্র তপ্তখলে ফেলিয়া জামীর লেবুর রসে বা কাগজী লেবুর রসে—তিন দিন মর্দ্দন করিলে পারদের ধাতু গ্রাসন শক্তি জন্মে।

৩। বিন্দুলী কীট—(লালবর্ণের ছোট পোঁকা) লবণ ও লেবুর রসের সহিত তিনদিন পারদ মর্দ্দন করিলে তাহার গ্রাসন শক্তি জন্মে।

৪। পূর্ব্বকথিত প্রক্রিয়ামতে হিঙ্গুলোথ পারদের অনুবাসন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, উহাকে একটী সীজের দৃঢ় শাখাতে অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ গর্ত্তে সমপরিমিত গন্ধকসহ পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপ প্রদান করিবে। পরে গুলঞ্চ ও শ্যামলতার দ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তিন দিবস জাল দিবে। এই প্রকারে পারদের স্বর্ণাদি যাবতীয় ধাতু সকলকে গ্রাস করিবার শক্তি জন্মে। এই গ্রাসন শক্তি বিশিষ্ট পারদ মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে প্রয়োজনীয়।

পারদ শোধন ও প্রয়োগের বিশেষ-বিধি।

ব্যবসায়িগণ বিক্রয়ের জন্য পারদের সহিত সীসক ও বঙ্গ মিশ্রিত করিয়া থাকেন। এই হেতু পারদে যে কৃত্রিম দোষ উৎপন্ন হয়; তাহার নাম যগুত্ব দোষ। পাতনত্রয় (অর্থাৎ উর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন

ও তির্য্যক্‌পাতন) দ্বারা, এই ষণ্ডত্ব দোষ বিনষ্ট হয়। বিষ, বহ্নি ও মল এই তিনটী পারদের স্বাভাবিক দোষ। এই দোষত্রয় যথাক্রমে মরণ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছার কারণ; অর্থাৎ পারদের বিষদোষ দ্বারা মানবের মৃত্যু ঘটে, বহ্নিদোষ দ্বারা সন্তাপ উপস্থিত হয় এবং মলদোষ দ্বারা মুর্চ্ছা হইয়া থাকে। নাগদোষ ও বঙ্গদোষ; পারদের এই দুইটী দোষকে যৌগিক দোষ বলা যায়। এই দুইটী দোষ দ্বারা মনুষ্যগণের জড়তা, আধ্মান ও কুষ্ঠরোগ জন্মে। ইহা ভিন্ন আর সাতটী পারদের উপাধিক দোষ আছে, এই সাতটী দোষ সপ্তকঞ্চুক নামে অভিহিত হয়। এই সপ্তকঞ্চুক ভূমিজ, গিরিজ ও বারিজ, অর্থাৎ ভূমিতল, পর্ব্বত ও জলের সংস্রবে ঐ সাতটি দোষ জন্মিয়া থাকে। এইরূপে রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ পারদের দ্বাদশটী দোষ নির্দ্দেষ করেন।

মেষলোম, হরিদ্রাচুর্ণ, ইষ্টকচুর্ণ, ঝুল, গোঁড়া লেবুর রস দ্বারা মর্দ্দনে নাগদোষ; রাখাল শশা ও ধলা আঁকড়ার মুলের ছাল চুর্ণ দ্বারা মর্দ্দনে বঙ্গদোষ; সোঁদাল ফলের মজ্জাদ্বারা মর্দ্দনে মলদোষ, চিতা মুলের চূর্ণ দ্বারা মর্দ্দনে বহ্নিদোষ, কৃষ্ণধুস্তুর দ্বারা মর্দ্দনে চাঞ্চল্য দোষ, ত্রিফলার কাথ দ্বারা মর্দ্দনে বিষদোষ, ত্রিকটু দ্বারা মর্দ্দনে গিরিদোষ, ও ত্রিকণ্টক দ্বারা মর্দ্দনে অসহাগ্নি দোষ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাতে পারদের অষ্টদোষ ও সপ্ত কঞ্চুকদোষ দূরীকৃত হয়।

মর্ম্ম ছিন্ন হইলে এবং ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, সেই সকল স্থলে পারদ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থলে পারদ প্রযুক্ত হইলে আশানুরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোধিত পারদ মৃদু অগ্নিতাপ সহ্য করে, মূর্চ্ছিত পারদ ব্যাধি নাশ করে, মারিত পারদ তীব্র অগ্নিতাপেও নিষ্কম্প ও বেগহীন অবস্থায় অবস্থিত থাকে, এবং তাহা মনুষ্যদিগের আয়ুঃ ও আরোগ্য প্রদান করে।

রসবন্ধ

বার্ত্তিককারগণ পারদের বন্ধনার্থ অর্থাৎ চাঞ্চল্য ও দুর্গ্রহত্ব নিবারণের জন্য পঞ্চবিংশতি প্রকার রস বন্ধের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। যথা :—

হঠ্‌ আরোট, হঠাভাস ও আরোটাভাস, ক্রিয়াহীন, পিষ্টি, ক্ষার, খোট, পোট, কল্কবন্ধ, কজ্জলি, সজীব, নির্জীব, নির্ব্বীজ, সবীজ, শৃঙ্খলা দ্রুতি বন্ধ, বালক, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ মুর্ত্তিবন্ধ, জলবন্ধ, অগ্নিবন্ধ, সুসংস্কৃত ও মহাবন্ধ। এই পঞ্চ বিংশতি প্রকার বন্ধ, কেহ কেহ জালুকা বন্ধ নামক আর এক প্রকার বন্ধ ক্রিয়া স্বীকার করিয়া ষড় বিংশতি প্রকার বন্ধ বলিয়া থাকেন।

জালুকা বন্ধ দৈহিক ক্রিয়ার উপযোগী নহে। কামিনী দ্রাবন কার্য্যে ইহা অতি প্রশস্ত। পারদ সম্যক্ শোধিত না করিয়া যদি তাহার বন্ধ ক্রিয়া করা হয় তবে তাহাকে হঠ্‌বন্ধ কহে। এইবন্ধ পারদ সেবিত হইলে মৃত্যু বা উৎকট ব্যাধি উৎপাদন করে। সুশোধিত পারদের বন্ধ ক্রিয়া হইলে তাহা আরোট বন্ধ নামে অভিহিত হয়। এই পারদ ক্ষেত্র করণে শ্রেষ্ঠ এবং ধীরে ধীরে ব্যাধি নাশক। ধাতু ও মুলাদি পদার্থ দ্বারা ভাবিত করিয়া বন্ধক্রিয়া করিলেও যাহার গুণ বিকৃতি হয় অর্থাৎ যদি সেই পারদ পুটপাককালে স্বভাবানুসারে অন্য পদার্থের সংযোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্গত হইয়া যায়, তবে তাহা হঠাভাস বা আরোটাভাস বন্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অশোধিত ধাত্বাদির সহিত যে পারদ সংস্কৃত হয় তাহাকে ক্রিয়াহীন বলা যায় এই পারদ সেবনের পর অপথ্য সেবন করিলে বিবিধ বিকার উপস্থিত হয়।

দ্রব্য বিশেষের সহিত পারদ গাঢ়তর রূপে মদ্দন করিয়া এবং তীব্র আতপে রাখিয়া, নবনীত তুল্য পিষ্টি প্রস্তুত করিলে, তাহাকে পিষ্টিকা বন্ধ

বলা যায়। পিষ্টিকা বন্ধ পারদ অগ্নির উদ্দীপক ও অত্যন্ত পাচক। শঙ্খ, শুক্তি ও কড়ি প্রভৃতির ক্ষার পদার্থের সহিত পারদ মর্দ্দন করিলে তাহাকে ক্ষারবন্ধ কহে। ক্ষারবন্ধ পারদ অগ্নির অত্যন্ত উদ্দীপক পুষ্টি জনক ও শূল নাশক।

যে বন্ধ পারদ খোটতা প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃ পুনঃ আধ্মাপিত করিলে ক্ষয় পাইয়া থাকে তাহাকে খোটবন্ধ বলা যায়। খোটবন্ধ পারদ শীঘ্র সর্ব্বরোগ নাশ কার।

কজ্জলি দ্রবীভূত করিয়া কদলী পত্রে ঢালিবে এবং কদলী পত্রাচ্ছাদিত পোট্টলীর চাপ দিয়া তাহা চ্যাপটা করিবে, ইহাকে পোটবন্ধ কহে।

দ্রব্য বিশেষের সহিত স্বেদাদি দ্বারা পারদকে পঙ্করূপে পরিণত করিলে তাহাকে কল্কবন্ধ কহে। কল্কবন্ধ পারদ কল্ক দ্রব্যের ফল প্রদান করিয়া থাকে।

পারদ, গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া মসৃণ কজ্জলবৎ পদার্থ প্রস্তুত হইলে, তাহা কজ্জলীবন্ধ নামে অভিহিত হয়।

যে বন্ধপারদ ভস্ম করিতে হইতে, অগ্নি যোগে নির্গত হইয়া যায়, তাহা সজীববন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সেবিত হইলে পারদ ভস্মের ক্রিয়া অথবা আশু ব্যাধিবিনাশ কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

অভ্র বা গন্ধকের সহিত জারিত হইয়া পারদ ভস্মীভূত হইলে তাহা সর্ব্বধাতুর শীর্ষস্থানীয় হয়। এইরূপ ভস্মীভূত পারদ অতি শীঘ্র সমুদায় রোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

চতুর্থাংশ পরিমিত স্বর্ণ ও সম পরিমিত গন্ধকের সহিত পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক পিষ্টীকৃত করিয়া তাহা পুটপাক দ্বারা জারিত করিলে নির্বীজ বন্ধ নামে কথিত হয়। ইহা সকল রোগ নাশক।

হীরকাদি সহযোগে জারিত পারদের সহিত অপর জারিত পারদ

সমান ভাগে মিশ্রিত করিলে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বলা যায়। এই পারদ দেহের দৃঢ়তা সাধক ইহা অতিশয় গুণ সম্পন্ন।

বাহ্যদ্রুতি বিশিষ্ট পারদ বদ্ধ হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হইলে তাহাকে দ্রুতিবদ্ধ পারদ বলা যায়। শ্বেত সর্ষপের চতুর্থাংশ পরিমিত ইহা সেবিত হইলে, দুঃসাধ্য রোগ সমূহ বিনষ্ট করে।

সমপরিমিত অভ্রের সহিত পারদ জারিত লইলে তাহা বালবদ্ধ নামে অভিহিত হয় উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবিত হইলে, ইহা আশু রসায়ন কার্য্য সম্পাদন করে, রোগপত্তির আশঙ্কা দূর করে— এবং উপদ্রব ও অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত পীড়া সমূহ ও বিনষ্ট করে। দ্বিগুণ অভ্রের সহিত যে পারদ জারিত হয়, তাহাকে কুমারবদ্ধ বলা যায়। এক তণ্ডুল মাত্রায় ইহা সেবনে তিন সপ্তাহ মধ্যে যাবতীয় পাপজব্যাধি (কুষ্ঠ প্রভৃতি) নিবারিত এবং রসায়ন হইয়া থাকে।

চতুর্গুণ অভ্রের সহিত জারিত পারদের নাম তরুণবদ্ধ। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। সপ্তাহকাল এই পারদ সেবনে সর্ব্বরোগ বিনাশ হয় এবং বীর্য্য ও বল উৎপন্ন হয়।

ছয়গুণ অভ্রের সহিত জীর্ণ হইয়া যে পারদ অগ্নিসহত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অগ্নিতাপে নির্গত হইয়া যায়, তাহাকে বৃদ্ধবদ্ধ বলা যায়। দেহহিতকর ঔষধ সমুহে এবং ধাতু সমুহের সংস্কার বিশেষে এই পারদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অভ্রজারণ না করিয়া কেবল দিব্য ঔষধির মুলাদির দ্বারা পারদ অতিশয় অগ্নিসহ হইলে, তাহা মূর্ত্তিবদ্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পারদ জারিত করিলে অগ্নিতাপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং সর্ব্বরোগে ইহা প্রযোজিত হইলে অনুপম উপকার পাওয়া যায়।

শিলাজল দ্বারা যে পারদ বদ্ধ হয়,তাহাকে জলবদ্ধ পারদ কহে। ইহা জরা, রোগ, ও মৃত্যু নাশক এবং কল্পনা অনুসারে তওদ্দ্রব্যের ফলপ্রদ।

কেবল পারদ কিংবা ধাতু মিশ্রিত পারদ আধ্মাত হইয়া গুটিকাকৃতি হইলে, এবং এই গুটিকা অগ্নিতাপে ক্ষয় প্রাপ্ত না হইলে, তাহা অগ্নি-বদ্ধ নামে অভিহিত হয়। এই পারদ খেচরত্ব জনক অর্থাৎ এই পারদ গুটিকা মুখে ধারণ করিলে মনুষ্য আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের সহিত পারদ আধ্মাপিত করিলে, উভয় দ্রব্য একত্র মিলিত হইয়া অতি দীপ্ত উজ্জ্বল গুটিকারে পরিণত হয়। তৎকালে তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত গুরু হইয়া থাকে। সেই গুটিকায় আঘাত করিলে লবণের ন্যায় চূর্ণীভূত হইয়া যায় ও ঘর্ষণ করিলে মলিন হয় না। ইহাই পারদের মহাবন্ধ। এই বন্ধ যথাযত সম্পন্ন না হইলে গুটীকা ক্ষণকালেই দ্রবীভূত হইয়া যায়।

উল্লিখিত বন্ধ প্রক্রিয়া গুলিতে অষ্টম সংস্কারে সংস্কৃত পারদ ব্যবহার্য্য কিংবা হিঙ্গুলোত্থ পারদও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

পারদ ভস্মবিধি

১ম প্রণালী

পলাশবীজ, রক্তচন্দন ও জামীরের রসের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া সজীববদ্ধ করিবে। পরে তাহা যন্ত্রে পাতিত করিলে মারিত হয়। অপামার্গ বীজ ও পদ্মবীজের কল্কের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মুষারুদ্ধ করিয়া দৃঢ়রূপে আধ্মাপিত করিলে পারদ ভস্মীভূত হয়।

২য় প্রণালী

কাকডুমুরের আঁঠা দ্বারা হিঙ্গু ভাবিত করিয়া, তাহার সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটদগ্ধ করিলে পারদ ভস্মরূপে পরিণত হয়।

৩য় প্রণালী

অপামার্গ বীজ ও এরণ্ডবীজ চূর্ণ করিয়া সেইচূর্ণ পারদের নীচে ও

উপরে দিয়া মূষা রুদ্ধ করিবে। এইরূপে চারিবার পুটপাক করিলে পারদ ভস্মত্ত্ব প্রাপ্ত হয়।

৪র্থ প্রণালী

পানের রসে পারদ মর্দ্দিত করিয়া কাঁকরোল মূলের গর্ভে স্থাপন পূর্ব্বক এক মৃণ্ময় মুষায় পুটপাক করিলেই পারদ ভস্মরূপে পরিণত হয়।

পারদ ভস্ম সেবনের সাধারণ নিয়ম।

পারদ ভস্ম সেবনের পর অধিক উদ্গার উদ্গত হইলে দধি-মিশ্রিত অন্ন, জীরাসহ কৃষ্ণ মৎস্য ভোজন করিবে। বায়ুর আধিক্য বোধ হইলে নারায়ণাদি তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। চিত্তের অস্থিরতা হইলে মস্তকে শীতল জল সেচন করিবে। তৃষ্ণা অধিক হইলে ডাবের জল ও চিনি মিশ্রিত করিয়া মূদগযূষ পান করিবে। রসবীর্য্য বৃদ্ধির জন্য দ্রাক্ষা দাড়িম, খর্জ্জুর ও কদলীফল, এবং দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও শর্করা ভোজন কর্ত্তব্য। রসসেবন পরিত্যাগ করিবার সময় পর্য্যন্ত বৃহতীফল বিল্ব প্রভৃতি পদার্থ ভোজন করিবে।

মকরধ্বজ প্রস্তুতবিধি।

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে মিশর, চীন প্রভৃতি দেশে বহু প্রাচীনকালে বিবিধ কলাবিদ্যা উদ্ভাবিত হইলেও অধিকাংশ বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল যে ভারতবর্ষেই প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, অধুনা জগতের যাবতীয় সুধীবর্গ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রাচীন বেদ সংহিতাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সর্ব্ব-

প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন যে বিবিধ ধাতু উপধাতু রস, উপরস প্রভৃতি ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় ত্রিদোষ বিজ্ঞান, বৈদিক ঔষধ পথ্য প্রয়োগ জ্ঞান এবং চিকিৎসা প্রণালী ব্যতীত তান্ত্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রকে জগতের অদ্বিতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র রূপে পরিণত করিয়াছে। মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদীয় তন্ত্রোক্ত মহৌষধ। বহুকাল যাবৎ এই মহৌষধ নানাপ্রকার সাধ্য অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া জীবজগতের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে।

পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণযোগে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। স্বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাত ৮ তোলা, পারদ ৬৪ তোলা, এবং গন্ধক ১২৮ তোলা, প্রথমতঃ স্বর্ণপত্র ও পারদ একত্র মাড়িয়া পরে গন্ধক সহ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিতে হয়, অনন্তর উহা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটী সমতল বোতলে পুরিয়া বালুকাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিতে হয়। উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বর্ত্তমানে সকলেই মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। উক্ত প্রণালীতে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে দেখা যায় যে স্বর্ণ বোতলের তলদেশে পড়িয়া থাকে, উহা পারদের সহিত মিশ্রিত হয় না। বোতলের গলদেশে পারদ ও গন্ধক একত্র অগ্নিতাপে উত্থিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করে। সাধারণের নিকট ইহাই মকরধ্বজ। আবহমানকাল হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কঠিন কঠিন রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু যে প্রণালীতে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, সে প্রণালী তন্ত্রোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তন্ত্রোক্ত প্রকৃত নিয়মানুসারে পারদ ও স্বর্ণের যথাবিধি সংস্কার করিয়া তদ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে স্বর্ণ নিঃশেষরূপে পারদের

সহিত মিশ্রিত হইবে এবং কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া এই স্বর্ণকে পারদ হইতে বিভিন্ন করিতে সমর্থ হইবে না।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে নিশ্চয়ই স্বর্ণ পারদের সহিত মিশ্রিত হইবে।

প্রথম বিধি ঃ—

স্বর্ণভস্ম—১ পল (৮ তোঃ)
মূর্চ্ছিত পারদ—৮ ,, (৬৪ তোঃ)
গন্ধক—১৬ ,, (১২৮ তোঃ)

একত্রে কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিনদিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে যে মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় তাহাতে সুবর্ণ পৃথক রূপে অবস্থান করে না।

দ্বিতীয় বিধি ঃ—

শোধিত স্বর্ণপত্র ১ পল, এবং গ্রাসনশক্তি বিশিষ্ট অর্থাৎ দশম সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত পারদ ৮ পল, গন্ধক ১৬ পল একত্রে কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে যে মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, তাহা হইতে স্বর্ণ পৃথক করা যায় না।

উক্ত প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত মকরধ্বজ সচরাচর প্রচলিত মকরধ্বজ অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক ফলপ্রদ।

ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রমতে পারদের বিভিন্ন প্রকার ধাতুকে গ্রাস করিবার শক্তি আছে। তবে কেবলমাত্র শোধিত পারদের গ্রাসন শক্তি থাকে না। আয়ুর্ব্বেদীয় রসশাস্ত্রে পারদের যে অষ্টাদশ প্রকার সংস্কারের বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের অবিদিত। তাঁহারা কেবল পারদের অষ্টবিধ সংস্কার

জ্ঞাত আছেন। অষ্টবিধ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত পারদের ধাতু-ভোজন শক্তি জন্মে না সুতরাং তদ্রূপ পারদের দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে তাহাতে স্বর্ণ যে পৃথক ভাবে অবস্থান করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? প্রচলিত মতে প্রস্তুত মকরধ্বজে কেবলমাত্র শোধিত পারদের উক্ত ধাতুগ্রাসন শক্তি থাকা সুদূর পরাহত।

(১) ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুতি বিধি :—গ্রাসন শক্তি বিশিষ্ট পারদ একপল গন্ধক ২ পল এবং শোধিত স্বর্ণ এক তোলা একত্রে কজ্জলি করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া সাধারণ মকরধ্বজ পাকের নিয়মে পাক করিলে যে মকরধ্বজ পাওয়া যাইবে তাহার সহিত পুনর্ব্বার পূর্ব্ব পরিমিত গন্ধক মাড়িয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ পাক করিবে। এইরূপে পারদের ছয় গুণ গন্ধক পর্য্যবসিত হইলে অর্থাৎ ঐরূপ ছয়বার পাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে!

সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুতি বিধি ঃ—

গ্রাসনশক্তি বিশিষ্ট পারদ দ্বারা সাধারণ মতে প্রস্তুত মকরধ্বজকে বিংশতিবার সমপরিমাণ গন্ধক দ্বারা মাড়িয়া বিংশতিবার পাক করিলে সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয় বিধি :—

ষড়্গুণবলিজারিত ও সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুতের দ্বিতীয় বিধি ঃ—

ষড়্গুণবলিজারণ বিধি—

বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে একটী মাটীর ভাণ্ডে প্রথমতঃ পারদের সমপরিমিত গন্ধক অগ্নিজালে পাক করিবে। গন্ধক গলিয়া তৈলের

ন্যায় হইলে, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ পারদের ছয়গুণ গন্ধক তাহাতে দেওয়া হইলে, বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীটী নামাইয়া, তাহার মধ্য হইতে পারদ ভাণ্ডটী তুলিয়া লইবে এবং ভাণ্ডের নীচে একটী ছিদ্র করিয়া তাহা হইতে পারদ বাহির করিয়া লইবে। এই পারদের নাম ষড়্গুণবলিজারিত পারদ।

ইহা দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ বলে।

ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুতি বিধি

গ্রাসনশক্তিযুক্ত ষড়্গুণবলিজারিত পারদ ১ পল (৮ তোলা) শোধিত স্বর্ণপত্র ১ তোলা, শোধিত গন্ধক (২ পল) ১৬ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিলে ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। এই ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ অনুপান যোগে সর্ব্বরোগ হর।

যদি পারদ শুদ্ধ গন্ধক দ্বারা জারিত হয় তাহা হইলে শোধিত পারদ অপেক্ষা শতগুণ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ প্রকার দ্বিগুণ গন্ধকে জারিত হইলে সর্ব্বকুষ্ঠাপহারী, ত্রিগুণ গন্ধকে জারিত হইলে যাবতীয় জড়তা নাশক, চতুর্গুণ গন্ধকে জারিত হইলে বলিপলিত নাশক, পঞ্চগুণ গন্ধকে জারিত হইলে ক্ষয়রোগাপহারী এবং ষড়্গুণ গন্ধকে জারিত হইলে সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

যে পারদ শতগুণ গন্ধক দ্বারা জারিত হইয়াছে যদি তাহাকে অভ্রসত্ব দ্বারা জারিত করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বীর্যবান হইয়া থাকে। আবার স্বর্ণমাক্ষিক খর্পর ও হরিতাল ইত্যাদি দ্বারা জারিত হইলে তদপেক্ষাও গুণশালী হইয়া থাকে। স্বর্ণের সহিত পারদ জারিত হইলে সহস্রগুণ বীর্য্য সম্পন্ন হয়।

সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুতি-বিধি ঃ—

বিংশতিগুণ শোধিত গন্ধক দ্বারা জারিত পারদ ১ পল্ (৮ তোলা) শোধিত স্বর্ণপত্র ১ তোলা এবং শোধিত গন্ধক ২ পল অর্থাৎ ১৬ তোলা একত্রে বালুকাযন্ত্রে যথাবিধি পাক করিলে সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। এই সিদ্ধ মকরধ্বজ অমৃত তুল্য, ইহা অনুপান ভেদে সর্ব্বরোগ নাশক। সর্ব্বপ্রকার অসাধ্য ব্যাধিতে, রোগিগণের মুমূর্ষ অবস্থায় ইহা যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ইহা প্রাচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের একটী শ্রেষ্ঠ মহৌষধ। পৃথিবীর কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই।

উপরে যে ষড়্গুণবলিজারিত এবং সিদ্ধমকরধ্বজের প্রস্তুতি বিধি লিখিত হইল, তাহা অভিজ্ঞতা প্রসূত। উক্ত প্রণালীতে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে তাহাতে স্বর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করিবে না। পারদ ও গন্ধকের সহিত মিশিয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ভারতীয় রসশাস্ত্রের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের নিকট উক্ত প্রক্রিয়াগুলি অপরিজ্ঞাত। তজ্জন্য বর্ত্তমান সময়ে খাঁটী মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় না।

অভ্র

অভ্র অমৃতস্বরূপ, কষায়মধুররস, ধাতুবর্দ্ধক, ব্রণ, কুষ্ঠনাশক বাতপিত্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক, মেধাবর্দ্ধক, ত্রিদোষ নাশক, আরোগ্যজনক বৃষ্য, আয়ুবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, উদর, গ্রন্থী, প্রমেহ, প্লীহা বিষ ও কফনাশক, অগ্নির উদ্দীপক, শীতবীর্য্য এবং অনুপান ভেদে সর্ব্বরোগ নাশক।

খনিজ অভ্রই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। উহা চারিপ্রকার,—পিনাক, নাগ, মণ্ডুক ও বজ্র। শ্বেতাদি বর্ণভেদে ইহারা প্রত্যেকেই আবার চতুর্ব্বিধ। পিনাক অভ্র অগ্নিতপ্ত হইলে তাহার দলগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়; ইহা সেবিত হইলে মনুষ্যের মলরোধ করিয়া প্রাণনাশ করে। নাগাভ্র অগ্নিসন্তাপে নাগের ন্যায় ফোস ফোস শব্দ করে; ইহা সেবন করিলে মণ্ডল-কুষ্ঠরোগ জন্মে। মণ্ডুকাভ্র অগ্নিতপ্ত হইলে স্ফীত হইয়া লাফাইয়া পড়ে; ইহা সেবিত হইলে শস্ত্রচিকিৎসারও অসাধ্য অশ্মরীরোগ উৎপাদন করে। বজ্রাভ্র অগ্নিসন্তাপে কোনরূপে বিকৃত হয় না; ইহা সেবনে দেহ লৌহসার এবং সর্ব্বরোগহীন হয়। বজ্রাভ্রই ঔষধে সর্ব্বথা ব্যবহার্য্য।

বর্ণভেদে অভ্র চারিভাগে বিভক্ত—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেত বর্ণ বিধানাদি কার্য্যে শ্বেত অভ্র, ও রক্তকর্ম্মে রক্ত অভ্র ও পীতকর্ম্মে পীত অভ্র ব্যবহার্য্য। রসায়ন কার্য্যে কৃষ্ণ অভ্রই সমধিক ফলপ্রদ। যে অভ্র স্নিগ্ধ, স্থূলদল, বর্ণবিশিষ্ট ও অধিক ভারযুক্ত, এবং যাহার দলগুলি অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। উত্তরদেশীয় পর্ব্বতজাত অভ্রই অত্যন্ত সত্ত্ববান ও গুণদায়ক।

চন্দ্রিকাযুক্ত অভ্র ঔষধার্থ প্রযোজ্য নহে। ইহা সেবন করিলে মেহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানারোগ জন্মে। অশুদ্ধ অভ্র আয়ুনাশক এবং বায়ু, কফ, ক্রিমি, ক্ষয়, বাত, শোথ, হৃদরোগ, পার্শ্ব, বেদনা, কুষ্ঠ ক্ষয় উৎপাদক অতএব সর্ব্বকার্য্যে শোধিত অভ্র প্রয়োগ করা উচিত।

অভ্রের শোধনবিধি

১। অভ্র উত্তপ্ত করিয়া ক্রমশঃ সাতবার কাঁজিতে, গোমুত্রে ত্রিফলার কাথে, বিশেষতঃ গোদুগ্ধে নিক্ষেপ করিলে বিশোধিত হয়।

২। অথবা অভ্রকে উত্তপ্ত করিয়া সাতবার নিসিন্দারসে স্বিন্ন করিলে উহা বিশোধিত হয়।

শোধনান্তে অভ্রকে ধান্যাভ্রে পরিণত করিবে।

ধান্যাভ্রবিধি।—অভ্রের চতুর্থাংশ শালিধান্যের সহিত অভ্রকে একত্র কম্বল বদ্ধ করিয়া তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে অভ্রকণা নির্গত হইবে তাহার নাম ধান্যাভ্র।

ধান্যাভ্র ব্যাতিরেকে অভ্র শোধন বিধি

অভ্রকে উত্তপ্ত করিয়া কুলের ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে উহাকে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিয়া চুর্ণ করিবে। এইভাবে শোধিত অভ্র ধান্যাভ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

অভ্রের মারণ বিধি

১। হরিতাল, আমলকীর রস ও সোহাগার সহিত শোধিত অভ্রকে মর্দ্দন করিয়া একদিবস গজপুটে পাক করিবে। ছয়বার এইভাবে মর্দ্দন ও পাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে অভ্রের নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয়। ইহা বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগে প্রশস্ত।

২। অথবা ঝোলাগুড় ও এরণ্ড পত্ররসে একদিন ভাবনা দিয়া অভ্রকে একদিবস গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে তিনবার ভাবিত ও পুটপক্ক অভ্র নিরুত্থভাবে ভস্মীকৃত হয়। ইহা বিশেষভাবে অগ্নিবর্দ্ধক।

৩। অথবা একভাগ ধান্যাভ্র দুইভাগ সোহাগার সহিত মর্দ্দিত করিয়া অন্ধমূষায় প্রবল অগ্নিতে পুটপাক করিবে।

৪। অথবা দুইভাগ ধান্যাভ্র একভাগ শোধিত গন্ধকের সহিত বটের দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া এক দিন গজপুটে পাক করিবে।

অভ্রের অমৃতীকরণ—

ঘৃত ও অভ্র তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া লৌহ ভাণ্ডে পাক করিবে। যখন ঘৃত মরিয়া যাইবে, তখনই জানিবে যে অভ্রের অমৃতীকরণ হইয়াছে। উহাই সর্ব্বকর্ম্মে প্রযোজ্য।

অন্যপ্রকার—

১৬ পল ত্রিফলোত্থ কষায় অর্থাৎ ত্রিফলার কাথ, অষ্টপল গোঘৃত দশপল মাড়িত অভ্র এই সমস্ত একত্র করিয়া লৌহভাণ্ডস্থ করতঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তরলপদার্থ শুষ্ক হইলেই উহা গ্রহণ করিতে হয়; ইহা সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

নিত্য সেবিত জারিত অভ্রের গুণ—

নিত্য সেবিত জারিত অভ্র রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক বীর্য্যবর্দ্ধক দীর্ঘায়ুঃ ও সিংহের ন্যায় বিক্রমাশালী পুত্রজনক অকাল মৃত্যু-নাশক ও রতিশক্তি বর্দ্ধক।

অভ্রভস্মের অনুপান

বিংশতিপ্রকার প্রমেহ রোগে—হরিদ্রা, পিপ্পলিচুর্ণ ও মধু অনুপান কর্ত্তব্য।

রাজযক্ষ্মারোগে—স্বর্ণভস্ম সহ অভ্রভস্ম ব্যবহার কর্ত্তব্য।

ধাতুবৃদ্ধিবিষয়ে—স্বর্ণ ও রৌপ্য ভস্ম সহ।

রক্তপিত্তে—হরীতকী, গুড়, এলা ও শর্করা।

রাজযক্ষা, পাণ্ডু ও প্লীহায় ঃ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চতুর্জাত (দারুচিনি এলাইচ তেজপত্র ও নাগেশ্বর) শর্করা ও মধুসহ প্রত্যহ প্রাতে ১ মাত্রা সেব্য। মাত্রা দুই রতি পূর্ণবয়স্ক পক্ষে।

শুক্রমেহেঃ—গুড়চীরস ইক্ষুগুড় অথবা চিনি সহ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে :—এলা, গোক্ষুর, ভূধাত্রী, শর্করা ও ঘৃতসহ।

সন্তত: জ্বর ও ভ্রমে :—পিপুলচুর্ণ ও মধু সহ।

দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধনে :—মধু ও ত্রিফলা সহ।

বিদ্রোধি ও দুষ্টব্রণে :—মূর্ব্বারস সহ।

অর্শে :—ভল্লাতক সহ।

বাতে :—শুঁঠ, পুষ্করমূল ভার্গী, অশ্বগন্ধা ও মধু সহ।

পিত্তবৃদ্ধিতে :—চতুর্জাত ও চিনি সংযোগে।

শ্লেষ্মা বৃদ্ধিতে :—কটফল পিপ্পলি ও মধু সহ।

পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করিতে :—সর্ব্বপ্রকার ক্ষার সংযোগে।

মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে :—এলা গোক্ষুর, ভূধাত্রী গোদুগ্ধ ও শর্করা।

শক্তিবর্দ্ধনে :—গোদুগ্ধ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড সহ সেব্য।

শুক্রস্তম্ভনে :—বিজয়ার রস সহ।

বাতরক্তে :—হরীতকী ও ইক্ষুগুড় সহ।

চক্ষুরোগে ও শুক্রবর্দ্ধনে :—ত্রিফলা, ঘি ও মধু সহ।

অভ্র সেবনের সাধারণ বিধি

১ বৎসর যাবৎ প্রত্যহ প্রাতে, ১ রতি অভ্রভস্ম এবং সমপরিমিত আমলকী, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ দ্বারা প্রস্তুত ১টী বটী সেবন করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বর্ষে মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ২টী করিয়া বটী এবং তৃতীয় বর্ষে প্রত্যহ তিনটী করিয়া বটী সেব্য। মানব উল্লিখিত নিয়মে একশত পল অভ্রভস্ম সেবন করিলে বলশালী ও স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি উপযুক্ত পথ্য পালন করিয়া এই অভ্রভস্ম সেবন করিলে তিন মাস মধ্যে সমুদয় রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ইহা দ্বারা রাজযক্ষ্মা, পাঁচপ্রকার কফ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, জটিল

উদরাময়, অর্শ, ভগন্দর, আমবাত, ক্ষয়, কামলা এবং অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

মৃত অভ্রের লক্ষণ

যথার্থরূপে ভস্মীভূত অভ্র নিশ্চন্দ্র এবং কজ্জল সদৃশ মসৃণ হইয়া থাকে। যে অভ্রভস্ম চন্দ্রিকাযুক্ত তাহা ঔষধে অব্যবহার্য্য।

অভ্রঅমৃতীকরণের বিশেষ বিধি

অভ্রভস্ম অরুণ ও কৃষ্ণভেদে দুই প্রকার। কেবল মাত্র কৃষ্ণবর্ণ অভ্রেরই অমৃতীকরণ প্রশস্ত।

অভ্রভস্মে পুটের বৈশিষ্ট

১। সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করিবার জন্য অভ্রকে দশ হইতে এক শতবার পুটপাক করিবে। রসায়ন কার্য্যে একশত হইতে এক সহস্রবার পর্য্যন্ত পুটপাক করা প্রয়োজন।

২। বায়ু নাশ করিবার জন্য অভ্রকে আঠারবার পুটপাক করিবে। পিত্ত নাশ করিবার জন্য উহাকে ছত্রিশবার পুটপাক করিবে; এবং শ্লেষ্মা নাশ করিবার জন্য উহাকে চুয়ান্নবার পুটপাক করিবে। অভ্রকে একশতবারের অধিককাল পাক করিলে তাহা বীজরূপে পরিণত হয়। উহা শোধিত হইলে বীর্য্য, ওজঃ, কান্তি, বল বৃদ্ধি হয়।

অভ্রমারকগণ

কাঁটানটে, বৃহতী, তাম্বূল, তগরপাদুকা, পুনর্ণবা, হিঞ্চে, থুলকুড়ি, চিরতা, আকন্দ, আদা, পলাশ, ইঁন্দুরকানী, ময়না, রাখালশশা, এরণ্ড এই সকল দ্রব্য দ্বারা পেষণ করিয়া পুট প্রদান করিলে অভ্র মাড়িত হয়।

অভ্র সেবনে অপথ্য

অভ্রসেবী ক্ষার, অম্ল, সকল রকমের ডাইল, কর্কটী, বেগুন, এবং তৈল সেবন পরিত্যাগ করিবেন।

অপক্ক অভ্র সেবনের দোষ

যে অভ্র সম্যক্‌রূপে ভস্মীভূত হয় নাই তাহা ভক্ষণ করিলে সহসা মৃত্যু উপস্থিত হয়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম সদৃশ গাত্র চর্ম্ম হয় এবং নানাপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে।

অপক্ক অভ্র সেবন জনিত দোষের শান্তি

দুই তোলা পরিমিত আমলকী শীতল জলে বাঁটিয়া তিন দিন সেবন করিলে অপক্ক অভ্র সেবন জনিত দোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

অভ্রের সত্ত্ব পাতন

অভ্রকে তাহার এক চতুর্থাংশ পরিমিত সোহাগা দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মুসলীর রসে মর্দ্দন করিয়া কোষ্ঠীকাযন্ত্রে পুটপাক করিলে অভ্রের সত্ত্ব নির্গত হইয়া থাকে।

অভ্রসত্ত্বের শোধন বিধি

গোমূত্রে তিন দিবস ভাবনা দিলে অভ্র সত্ত্ব শোধিত হয়।

অভ্রসত্ত্বের ভস্মীকরণ

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক একত্রে কজ্জলী করিয়া তিনভাগ অভ্র সত্ত্বের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মর্দ্দিত দ্রব্যকে পিণ্ডীভূত করিয়া এরণ্ড পত্রে রুদ্ধ করিয়া এক ঘণ্টাকাল একটি তামার পাত্রে রৌদ্রে রাখিবে। তাহার পর ইহাকে তিন দিন যাবৎ ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তাহার পর বাহির করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে বিশুদ্ধ অভ্র সত্ত্ব ভস্ম পাওয়া যায়।

অভ্রসত্ত্বের সেবনবিধি।

অভ্র সত্ত্ব যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত ত্রিফলার কাথে ভাবনা দিবে। তাহার পর উহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে, তাহার পর ইহার সহিত ভৃঙ্গরাজের রস, আমলকীর রস, হরিদ্রার রস, মধু, ছাগীঘৃত, গোমূত্র, মিশ্রিত করিয়া উহাকে একটি লৌহ সম্পুটে রুদ্ধ করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে এক মাস রাখিয়া দিবে। তাহার পর উহাকে বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। ঘৃত ও মধু সহ উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে মানব নানাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে এবং তাহার আয়ু ও বল বৃদ্ধি হয়।

অভ্রদ্রুতি

১। বিশুদ্ধ অভ্রকে সমপরিমিত কর্কোটীচূর্ণ ও পঞ্চামৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া একদিন অম্লরসে মর্দ্দন করিবে। তাহার পর উহাকে মূষারুদ্ধ করিয়া একদিন পুটপাক করিলে অভ্র পারদের ন্যায় তরল হইয়া থাকে।

২। ধান্যাভ্রকে বকফুলের পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া একটী ওলের ভিতর পুরিয়া গোয়াল ঘরে এক হস্ত পরিমিত গর্ত্ত করিয়া রাখিবে। একমাস পরে উদ্ধৃত করিলে দেখা যাইবে যে উহা পারদের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইয়াছে।

মাক্ষিক

মাক্ষিক—স্বর্ণশৈল হইতে উৎপন্ন এবং কাঞ্চন বর্ণ রসবিশেষ। মাক্ষিক ধাতু দুই প্রকার। স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক। স্বর্ণমাক্ষিক ঈষৎ অম্লরসবিশিষ্ট, মধুররস এবং রৌপ্যমাক্ষিক কিঞ্চিৎ কষায়যুক্তমধুর রস। উভয় মাক্ষিকই শীতবীর্য্য, পাকে কটু ও লঘু। ইহা সেবন করিলে জরা ব্যাধি ও বিষ দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। কান্যকুব্জ দেশজাত স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ সদৃশ এবং তপ্তী নদীর তীরভূমিজাত স্বর্ণমাক্ষিক পঞ্চ-বর্ণযুক্ত ও স্বর্ণ সদৃশ। রৌপ্যমাক্ষিক বহুপ্রকার বিশিষ্ট এবং স্বর্ণমাক্ষিক অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট। মাক্ষিক সকলরোগনাশক, রসেন্দ্রের প্রাণস্বরূপ, অত্যন্ত বৃষ্য, দুর্ম্মেলক ধাতুদ্বয়ের মিলনকারক, বহুগুণযুক্ত এবং সমুদায় রসায়নের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

কোন কোন রসাচার্য্যের মতে মাক্ষিক তিন ভাগে বিভক্ত। পীত-মাক্ষিক, শ্বেতমাক্ষিক ও রক্তমাক্ষিক। এই তিন প্রকার মাক্ষিকও আবার ক্ষেত্র ও আকৃতি ভেদে চারি ভাগে বিভক্ত। যথা—এক প্রকার কদম্বপুষ্পের ন্যায় গোল, শুক্তিপুটের আকৃতি বিশিষ্ট, অঙ্গুরীর ন্যায় ও তুবরীভস্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

অশোধিত মাক্ষিক সেবনে দোষ

অশোধিত মাক্ষিক সেবন করিলে ক্ষুধানাশ, বলহানি, বিষ্টম্ভ, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা, ব্রণ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

মাক্ষিকের শোধন বিধি

এরণ্ড তৈল, ছোলঙ্গ লেবু বা কদলীমূলের রসের সহিত মাক্ষিক দুই ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়। অথবা অগ্নিতাপে উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার ক্কাথে নিক্ষেপ করিলেও মাক্ষিকধাতু শোধিত হইয়া থাকে।

মাক্ষিকের মারণ বিধি

শোধিত মাক্ষিক ও গন্ধক একত্র মাতুলুঙ্গ লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, পাঁচবার পুটদগ্ধ করিলে মৃত হয়। এরণ্ড তৈল, গব্যঘৃত ও মাতুলুঙ্গ লেবুর রসের সহিত খর্পর পাত্রে পাক করিলেও মাক্ষিক মৃত হইয়া ভস্মরূপে পরিণত হয়। এইরূপে মৃত মাক্ষিক ধাতুরূপ ক্রিয়ায় ও রসায়ন কার্য্যে প্রযোজ্য।

মাক্ষিকের সত্ত্বপাতন বিধি

ত্রিশভাগ সীসক মিশ্রিত মাক্ষিক, ক্ষার ও অম্লদ্রব্যের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মুখখোলা মূষায় রাখিয়া দগ্ধ করিলে, মাক্ষিকের সত্ত্ব নিঃসৃত হয়। তৎপরে সেই সত্ত্ব সাতবার গলাইয়া নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিলে মাক্ষিক সত্ত্ব মিশ্রিত সীসক নষ্ট হইয়া যায়। মধু, এরণ্ড তৈল, গোমূত্র, গব্যঘৃত ও কদলীমূলের রস এই সকল দ্রব্যের পুনঃপুনঃ ভাবনা দিয়া মূষা মধ্যে পুটদগ্ধ করিলেও মাক্ষিকের তাম্রবর্ণ মৃদু সত্ত্ব নির্গত হয়। এইরূপে গলিত সত্ত্ব শীতল হইলে, তাহা গুঞ্জা ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়।

মাক্ষিক সত্ত্বের প্রয়োগ বিধি

মাক্ষিক সত্ত্ব ও পারদ একত্র মর্দ্দন করিতে করিতে উভয়ে মিশ্রিত হইলে, তাহার সহিত গন্ধক মিশাইবে, তৎপরে তাহাতে অভ্রসত্ত্ব নিক্ষেপ করিয়া সমুদায় দ্রব্য খলে মর্দ্দন করিবে। অতঃপর তাহার দ্বারা গোলক প্রস্তুত করিয়া, লবণযন্ত্রে অর্দ্ধদিবস মৃদু অগ্নিতাপে তাহা পাক করিবে, এবং পাকের পর শীতল হইলে তাহা চূর্ণ করিবে। এই মাক্ষিকসত্ত্ব দুই রতি মাত্রায় মধু, ত্রিকটু চূর্ণ ও বিড়ঙ্গচূর্ণের সহিত সেবন করিলে বিবিধ রোগজনক জরা, অপমৃত্যু এবং দুঃসাধ্য ব্যাধিসমূহ সপ্তাহ মধ্যে নিবারিত হয়। ইহা অমৃতের অধিক উপকারী।

মাক্ষিকের সত্ত্বদ্রুতি

এরণ্ড তৈল, গুঞ্জাফল মধু, ও সোহাগা এই সকল দ্রব্যের সহিত মাক্ষিক সত্ত্ব মর্দ্দন করিলে, তাহা দ্রবীভূত হয়।

মাক্ষিক ভস্মের অনুপান

ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ এবং ঘৃত এইসকল দ্রব্য অনুপানে মাক্ষিক ভস্ম ব্যবহার্য্য।

অশুদ্ধ মাক্ষিক ভক্ষণজনিত দোষের শান্তি

অশুদ্ধ মাক্ষিক ভক্ষণজনিত দোষে কুলত্থ কলায় ও দাড়িম ছালের ক্কাথ সেবন উপকারী।

বিমল

বিমল তিন প্রকার। স্বর্ণ বিমল, রৌপ্য বিমল ও কাংস্য বিমল। স্বর্ণাদির ন্যায় কান্তি অনুসারেই বিমলের এইরূপ নামভেদ হইয়া থাকে।

অর্থাৎ যে বিমল দেখিতে স্বর্ণের ন্যায় তাহাকে স্বর্ণবিমল, যাহা রৌপ্যের ন্যায় উজ্জল শুক্লবর্ণ তাহা রৌপ্যবিমল এবং যাহা কাংস্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহা কাংস্য বিমল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিমল বর্ত্তুলাকৃতি, কোণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ এবং ফলকযুক্ত। ইহা বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য ও অত্যন্ত রসায়ন। স্বর্ণ ক্রিয়ায় স্বর্ণ বিমল, রৌপ্যকার্য্যে রৌপ্যবিমল এবং ঔষধাদিতে কাংস্য বিমল ব্যবহৃত হয়। কাংস্যবিমল অপেক্ষা রৌপ্য-বিমল ও রৌপ্যবিমল অপেক্ষা স্বর্ণবিমল অধিক গুণযুক্ত।

বিমলের শোধন প্রণালী

বাসকের কাথ, জামীরের রস অথবা মেষশৃঙ্গীর ক্বাথের সহিত সিদ্ধ করিলে, বিমল ও অন্যান্য ধাতু শোধিত হয়।

বিমলের ভস্মীকরণ বিধি

গন্ধক ও মান্দারের রসের সহিত অথবা সোহাগা, মান্দারের রস ও মেষশৃঙ্গীর ভস্ম সহ বিমল মর্দ্দন করিয়া মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিবে এবং তাহার উপর মাটীর প্রলেপ দিয়া শুষ্ক হইলে যথাক্রমে দশবার পুটপাক করিবে এইরূপে বিমল ভস্মীভূত হয়।

বিমল হইতে সত্ত্বপাতন

বিমলের সহিত সমপরিমিত সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, হীরাকস ও সোহাগা এবং বন্য ওল ও ঘণ্টা পারুলের ক্ষার মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সজিনার রস ও কদলীমূলের রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। তৎপরে তাহা মূষারুদ্ধ করিয়া পুটদগ্ধ করিবে। এইরূপে বিমল হইতে উজ্জ্বল সত্ত্ব নির্গত হয়।

বিমল সত্ত্বের প্রয়োগ বিধি ঃ—

বিমল ১ভাগ, পারদ ১ভাগ, গন্ধক ১ভাগ, হরিতাল ৩ ভাগ, মনঃশিলা ৫ ভাগ, রৌপ্য ভস্ম দশভাগের এক ভাগ, বৈক্রান্ত ভস্ম দশ ভাগের এক ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সুচূর্ণিত হইলে বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে।

তৎপরে সেই চূর্ণ কূপী মধ্যে পূর্ণকরিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে এবং বিমল ত্রিকটু ও ত্রিফলার চূর্ণ এবং ঘৃতের সহিত সেবন করিলে জরা, শোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, অরুচি, অর্শ, গ্রহণী, শূল, যক্ষ্মা, কামলা ও বাত পিত্তজ সর্ব্ববিধ পীড়া নিবারিত হয়।

শিলাধাতু (শিলাজতু)

স্বর্ণাদি পার্ব্বত্য ধাতু সকল সূর্য্য সন্তাপে গলিত হইয়া দ্রুত হয়। তাহা হইতে লাক্ষা সদৃশ মৃদু, মসৃণ ও স্বচ্ছ যে মলপদার্থ বহির্গত হয় তাহাকে শিলাজতু কহে। শিলাজতু রসায়ণ গুণ বিশিষ্ট। ইহা দুই প্রকার, কর্পূর শিলাজতু ও গোমূত্র শিলাজতু, গোমূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত শিলাজতুকে গোমূত্র শিলাজতু এবং কর্পূরের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট শিলাজতুকে কর্পূর শিলাজতু কহে। তন্মধ্যে গোমূত্রগন্ধি শিলাজতু দুই প্রকার; সসত্ব ও নিঃসত্ব। এই উভয়ের মধ্যে সসত্ব শিলাজতুই অধিক গুণশালী। হিমালয় পর্ব্বতের স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, বঙ্গ ও সীসকগর্ভ পাদদেশ তীব্র সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে শিলাজতু নিঃসৃত হইয়া থাকে।

শিলাজতুর প্রকার ভেদ—

স্বর্ণ শিলাজতু ঃ—

স্বর্ণ শিলাজতু মধুর, অম্লতিক্ত, জবাফুল সদৃশ, স্নিগ্ধ, গৈরিক বর্ণবৎ, বিপাকে কটুতিক্ত, ও বাতপিত্ত নাশক। ইহা স্বর্ণগর্ভ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

রজতশিলাজতু ঃ—

ক্ষার, কটু, অম্লরস বিশিষ্ট এবং বিদাহি, বিপাকে মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরু, পাণ্ডু, পিত্ত, মেহ, অজীর্ণ, জ্বর, শোষ, প্লীহা ও বাত নাশক। ইহা রৌপ্য গর্ভ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

তাম্রশিলাজতু ঃ—

তাম্রশিলাজতু ময়ূরকণ্ঠাভ, তিক্ত, কটুরস, তীক্ষ্ণ, কটুবিপাক, মেহ, অম্লপিত্ত, জ্বরও শোষ নাশক। ইহা তাম্রগর্ভ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

লৌহশিলাজতু

লৌহ শিলাজতু তিক্ত, লবণান্বিত, কটুবিপাক ও শীতল। লৌহ শিলাজতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা রসায়ন এবং ত্রিদোষ নাশক।

বঙ্গশিলাজতু

বঙ্গশিলাজতু তিক্ত, কটু, ঘন, কর্দ্দমবৎ এবং বঙ্গ সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সদ্য জলোদর, প্রমেহ, জ্বর, ক্ষয়, শোষ ও বিসর্প নাশক। ইহা বঙ্গগর্ভ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত।

সীসকশিলাজতু ঃ—

সীসকশিলাজতু মৃদু, উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত, কুসুমবর্ণবিশিষ্ট, কটুরসপ্রধান, বর্ণতেজ এবং বীর্য্যবৃদ্ধিকর। সীসকগর্ভপর্ব্বত হইতে ইহা নিঃসৃত হয়।

বিশুদ্ধশিলাজতুর পরীক্ষা বিধি ঃ—

যে শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নির্ধূম ভাবে দগ্ধ হইয়া লৌহ মলের ন্যায় হয়, এবং পরে তাহা জলে ফেলিলে প্রথমে ভাসিতে থাকে এবং ক্রমশঃ তারের মত গলিয়া নীচে পড়িয়া যায়—তাহাই উৎকৃষ্ট শিলাজতু।

শিলাজতুর সাধারন গুন ঃ—

শিলাজতু অনম্ল, কষায়, কটুবিপাক, নাত্যুষ্ণ ও নাতিশীতল। ইহা যোগবাহি, রসায়ন, ছেদি, কফ, কম্প, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, অপস্মার, বাত, অর্শ, উন্মাদ, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, ক্রিমি, জ্বর, পাণ্ডু, শোথ,

মেহ, অগ্নিমান্দ্য, মেদরোগ, যক্ষ্মা, শূল, গুল্ম, প্লীহা, আম, সর্ব্বপ্রকার ত্বক ও গর্ভ রোগ, উদররোগ, হৃদ্রোগ ও আমাশয় রোগ নাশক।

শিলাজতুর শোধন বিধি —

ত্রিফলার ক্বাথ, গোদুগ্ধ এবং ভৃঙ্গরাজের রস, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা শিলাজতুকে একদিন মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে উহা বিশোধিত হয়। বাতঘ্ন পিত্তঘ্ন ও কফঘ্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটির বা সকলের ক্বাথে সপ্তাহ কাল ভাবনা দিলে শিলাজতুর বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

শিলাজতুর ভাবনা বিধি—

শিলাজতু, ঈষদুষ্ণ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের ক্বাথে প্রক্ষিপ্ত করিবে এবং ক্বাথ শুষ্ক হইলে পুনরায় অপর ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ সাত দিবস করিলেই ভাবনা দেওয়া হয়। শিলাজতুর সমান ক্বাথ্য দ্রব্য চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে; উষ্ণাবস্থায় তাহাতে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া ও তাহা আলোড়ন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া লইবে এবং পুনরায় উক্তরূপে প্রস্তুত ক্বাথ তাহাতে দিবে। এইরূপ সপ্তাহ কাল করিবে। এইরূপে প্রস্তুত শিলাজতু ও জারিত লৌহ (শিলাজতুর চতুর্থাংশ লৌহভস্ম) একত্র দুগ্ধসহ সেবন করিলে সুখকর দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। ইহা জরাব্যাধি নাশক, দেহের উৎকৃষ্ট দৃঢ়তা সম্পাদক, মেধা স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক এবং ধন্য, এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধপ্রধান দ্রব্য আহার করিবে।

শিলাজতুর সেবনকাল ও মাত্রা বিধি—

শিলাজতু সেবনকাল ত্রিবিধ। যথা সাত সপ্তাহ উৎকৃষ্ট প্রয়োগ, তিন সপ্তাহ মধ্যম প্রয়োগ এবং এক সপ্তাহ অধম প্রয়োগ। ইহার

মাত্রাও ত্রিবিধ, যথা ১ পল উত্তম মাত্রা, অর্দ্ধ পল মধ্যম মাত্রা এবং এক কর্ষ অধমমাত্রা। শিলাজতু সেবনকালে বিদাহি ও গুরুপাক দ্রব্য এবং কুলথকলায়, কাকমাচি ও কপোত মাংস ত্যাগ করিবে। দুগ্ধ, শুক্ত, মাংস রস, যূষ, জল, গোমূত্র এবং নানাবিধ কষায়সহ শিলাজতু আলোড়িত করিয়া সেবন করিবে। শিলাজতুসেবী শিলাজতু সেবনের পূর্ব্বে, সেবনকালে, এবং সেবনের পরে ব্যায়াম, আতপ সেবন, বায়ু সেবন, চিন্তা, গুরুপাক দ্রব্য, বিদাহি দ্রব্য, অম্ল দ্রব্য, ভর্জ্জিত দ্রব্য এবং দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। সযত্ন রক্ষিত বৃষ্টিরজল, কূপেরজল ও নির্ঝরিণীজল পান করিবে।

বিশুদ্ধ শিলাজতুর পরীক্ষা :—

যে শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে লিঙ্গের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে এবং যাহা হইতে ধূম উদ্গত না হয় ও যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে বিলীন হইয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ শিলাজতু।

শিলাজতুর ভস্ম বিধি :—

শিলাজতুর সমপরিমিত মনঃশিলা, গন্ধক ও হরিতাল একত্র মিশ্রিত করিয়া মাতুলুঙ্গ লেবুর রসে মাড়িয়া আটখানি বনঘুটে দ্বারা পুটপাক করিলে শিলাজতু ভস্মীভূত হয়।

শিলাজতু সেবন বিধি :—

শিলাজতু ভস্ম দুইরতি, কান্তলৌহ ভস্ম ২ রতি ও বৈক্রান্ত ভস্ম ২ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ এবং ঘৃতের সহিত, পাণ্ডু যক্ষ্মা, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, অর্শ, গুল্ম, প্লীহা, উদর, বহুবিধশূল ও যোনিব্যাপদ প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবে। রসায়ন বিধানানুসারে শিলাজতু ছয়মাস সেবন করিলে, বলী-পলিত-শূন্য দেহে একশত বৎসর সুখে জীবিত থাকা যায়।

শিলাজতুর সত্ত্বপাতন—

দ্রাবণ বর্গ ও অম্লবর্গের সহিত শিলাজতু পেষণ পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া কয়লা দ্বারা হাপরে দগ্ধ করিলে শিলাজতুর লৌহ সদৃশ সত্ত্ব নিঃসৃত হয়। কর্পূরগন্ধি শিলাজতু পাণ্ডুবর্ণ ও বালুকাকৃতি। এই শিলাজতু মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক। বড় কইমাছের ক্বাথে ইহা সুস্বিন্ন করিলে শোধিত হয়। পণ্ডিতগণ এই শিলাজতুর মারণ ও সত্ত্ব পাতন আবশ্যক বোধ করেন না।

অশুদ্ধ শিলাজতু সেবনের দোষ :—

অশুদ্ধ শিলাজতু সেবনে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পিত্তবিকার, শোণিতস্রাব, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়।

অশুদ্ধ শিলাজতু সেবন জনিত বিকার নিবারণের উপায় :—

সিকি তোলা পরিমিত গোলমরিচ চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অশুদ্ধ শিলাজতু সেবন জনিত বিকার নিবারিত হয়।

ঔষরাখ্য শিলাজতু

শিলাজতু দুই প্রকার; গিরিসম্ভূত ও মৃত্তিকা সম্ভূত। ঔষরাখ্য শিলাজতুকে মৃত্তিকা সম্ভূত কহে। ইহা এক প্রকার শ্বেতক্ষার পদার্থ। ইহা অগ্নি বর্দ্ধক, বর্ণ প্রসাদক এবং যাবতীয় মূত্ররোগে হিতকর। গিরিসম্ভূত শিলাজতুর প্রকার ভেদ ও গুণ পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(তুত্থক) তুঁতে

তাম্র ও গন্ধক সহযোগে তুঁতে প্রস্তুত হইয়া থাকে! ইহা কিয়ৎপরিমাণে তাম্রের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। ইহা কটু, তিক্ত, ক্ষার ও কষায় রস

বিশিষ্ট, বমনকারক ও লঘু। ইহা ভেদক, লেখন গুণ বিশিষ্ট, পীত বীর্য্য, কফ, পিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা ও ক্রিমিনাশক।

তুঁতের শোধন বিধি (১)ঃ—একদিন লেবুর রসে মাড়িয়া লঘুপুটে পাক করিবে। তাহারপর তিনদিন অম্ল দধির দ্বারা ভাবনা দিবে।

তুঁতের শোধন বিধি (২)ঃ—তুঁতের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া উহাকে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহাকে উত্তমরূপে গজপুটে পাক করিবে। তুঁতেকে অম্লবর্গে ও তৈলে অথবা তক্রে নিসিক্ত করিয়া অশ্বমূত্রে এবং গোমূত্রে ১ দিন দোলা যন্ত্রে পাক করিলে ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

তুঁতের সত্ত্ব পাতনঃ—সমপরিমাণ সোহাগার সহিত তুঁতেকে গলাইলে উহার সত্ত্ব পাতিত হইয়া থাকে।

বিনা অগ্নিযোগে তুঁতের সত্ত্বপাতনঃ—তুঁতেকে চূর্ণ করিয়া লেবুরসে লৌহ পাত্রে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিলেও ইহা হইতে সত্ত্ব নিঃসৃত হয়।

ময়ূরপুচ্ছ হইতে তাম্র প্রস্তুত বিধিঃ—ময়ূর-পুচ্ছকে ঘৃত ও মধু সংযোগে ভস্ম করিবে। তৎপরে উহার সহিত উহার সমপরিমিত খইল, গুগ্গুলু, ক্ষুদ্রমৎস্য, সোহাগা, মধু, গুড়, অশ্বত্থ-বৃক্ষের গালা ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া একটি তাল পাকাইবে। তৎপরে ঐ তালটিকে একটি অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। ইহার দ্বারা যে তাম্র প্রস্তুত হয় তাহাকে নাগতাম্র কহে।

শূলঘ্ন অঙ্গুরীয়কঃ— তুথকসত্ত্ব, নাগতাম্র এবং স্বর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া স্বর্ণকার দ্বারা একটি অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিবে।

এই অঙ্গুরীয়ক ধারণমাত্র যাবতীয় শূলবেদনা সদ্য নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ ও ভূতদোষ নষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ রসাচার্য্য ভালুকি বলিয়াছেন যে তৈল মধ্যে এই অঙ্গুরীয়ক নিক্ষিপ্ত করিয়া উত্তপ্ত করিলে, সেই তৈল মর্দ্দনে শরীরের যে কোন স্থানের বেদনা নিবারিত হয়, ইহা মর্দ্দনে সত্বর প্রসব বেদনাও নিবারিত হয় এবং প্রসূতি সুখে সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। এই তৈল প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

তুথকসত্ত্বের ভস্ম বিধি ঃ—তুথকসত্ত্ব ১ ভাগ, পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ একত্র লেবুর রসে ৯ ঘণ্টা মর্দ্দন করিয়া উহাকে ধুতুরা পত্রে বন্ধন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পুট শীতল হইলে তুথক সত্ত্ব চূর্ণ করিয়া লইবে। উহাই তুথক সত্ত্ব ভস্ম।

অশুদ্ধ তুথক সেবন-জনিত বিকার নিবারণের উপায়ঃ—তিন দিন গোঁড়া লেবুর রস পান করিলে অশুদ্ধ তুথক সেবন-জনিত বিকার নিবারিত হয়।

সস্যক

সস্যক ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় বিবিধ বর্ণযুক্ত ও অতিভারশীল।

সস্যক সর্ব্বদোষনাশক এবং বিষদোষ, হৃদ্রোগ, শূল, অর্শ, কুষ্ঠ অম্লপিত্ত, মলাদির বিবন্ধ ও শ্বিত্ররোগের উপশম কারক। ইহা রসায়ন, বমন ও বিরেচন—কারক এবং দূষীবিষ নাশক। রক্তবর্গের ভাবনা দিলে অথবা স্নেহ বর্গদ্বারা সাতবার সিক্ত করিলে সস্যক শোধিত হয়। গো মহিষ ও ছাগের মূত্রে তিন প্রহর দোলা যন্ত্রে পাক করিলে সস্যক এবং খর্পর শোধিত হইয়া থাকে। মান্দারের রস, গন্ধক ও সোহাগার সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক, মূষা মধ্যে বদ্ধ করিয়া কুক্কুটপুটে দগ্ধ করিলে সস্যক মৃত হইয়া থাকে। সস্যকের ভস্ম চতুর্থাংশ পরিমিত সোহাগার

সহিত করঞ্জতৈলে ১ দিন ভিজাইয়া অন্ধমূষায় তিন দিন অঙ্গারাগ্নিতে হাপরে দগ্ধ করিলে, ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ অতি সুন্দর সস্যকসত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা অল্প সোহাগা ও লেবুর রসের সহিত মর্দ্দনপূক মূষাবদ্ধ করিয়া হাপরে দগ্ধ করিলেও সস্যকের তাম্র বর্ণ সত্ত্ব নিঃসৃত হয়।

কিম্বা শোধিত সস্যক ও মনঃশিলা পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সমূহের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক দগ্ধ করিলেও সত্ত্ব নির্গত হয়। এইরূপ নানাবিধানে সস্যকের সত্ত্ব নিঃসৃত হইয়া থাকে।

সস্যক সত্ত্বের অঙ্গুরীয়ক:—কঠিন সীসক সত্ত্বের সহিত এই সস্যক সত্ত্ব মিশ্রিত করিয়া তাহার মুদ্রিকা (আংটী ও মাদুলি) স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ শূল নিবারিত হয়। এই মুদ্রিকা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বিষ ও ভূত ডাকিনীর দৃষ্টি জন্য পীড়া সমূহ নাশ করে। ইহা দৃষ্ট প্রত্যয় জনক। অগ্নিতপ্ত তৈলে এই মুদ্রিকা নিক্ষেপকরিয়া সেই তৈল লেপন করিলে, যে কোন স্থানের শূল তৎক্ষণাৎ নিশ্চিত নিবারিত হয়। ইহা সদ্যপ্রসব কারক ও আশু নেত্ররোগ নাশক।

চপল

চপল চারিপ্রকার। গৌরবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, অরুণ বর্ণ, ও কৃষ্ণবর্ণ তন্মধ্যে স্বর্ণ বর্ণ ও রৌপ্য বর্ণ চপল বিশেষরূপে রসবন্ধন কারক। অপর দুইপ্রকার অর্থাৎ অরুণ ও কৃষ্ণচপল লাক্ষারন্যায় শীঘ্র গলিয়া যায়, এবং তাহারা নিষ্ফল অর্থাৎ গুণহীন। অগ্নিতাপে বঙ্গের ন্যায় চপল শীঘ্র গলিয়া যায় এইজন্য ইহা চপল নামে অভিহিত হইয়াছে। চপল লেখনকারক, স্নিগ্ধ, দেহের দৃঢ়তাকারক রসরাজের সহায়, উষ্ণবীর্য্য এবং তিক্ত ও মধুররস। ইহা স্ফটিককান্তি, ষট্‌কোণ, স্নিগ্ধ, গুরু, ত্রিদোষনাশক

অতিশয় বৃষ্য ও রসের বন্ধন কারক। কাহারও মতে চপল মহারস মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

জামীর, কর্কোটক, (কাঁকরোল) ও আদায় রসে ভাবনা দিলে চপল শোধিত হইয়া থাকে। অথবা চপলপ্রস্তর প্রথমে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ কাঁজি, উপবিষ ও বিষের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহার পিণ্ড করিবে, পরে পাতন যন্ত্রে যথাবিধি পাক করিয়া তাহা পাতিত করিবে। এইরূপে চপল শোধিত হয়।

রসক (খর্পর)

রসক দুই প্রকার; দুর্দ্দ্র ও কারবেল্লক। দলবিশিষ্ট রসককে দুর্দ্দ্র রসক, এবং দলহীন রসক্‌কে কারবেল্লক রসক কহে। ইহার মধ্যে দুর্দ্দ্র রসক সত্ত্বপাতন কার্য্যে, এবং কারবেল্লক রসক ঔষধ ক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। রসক সর্ব্ববিধ মেহনাশক। কফপিত্ত নিবারক, নেত্ররোগ নাশক ও ক্ষয় নিবারক। ইহা লৌহ ও পারদের রঞ্জনকারক। রস ও উভয়বিধ রসক দেহের অত্যন্ত দৃঢ়তাকারক। রস ও রসককে অগ্নি-তাপে স্থির রাখিতে পারিলে দেহ সুদৃঢ় হইয়া থাকে। রসক তিক্ত অলাবু রসে আলোড়িত করিয়া পাক করিলে শুদ্ধ, নির্দ্দোষ ও পীতবর্ণ হয়। রসক অগ্নিতপ্ত করিয়া সাতবার মাতুলুঙ্গ রসে নিমগ্ন করিলেও নির্ম্মল হইয়া থাকে। অথবা রসককে অগ্নিতপ্ত করিয়া এক একবার নরমূত্র, অশ্বমূত্র, তক্র ও কাঁজিতে নিমগ্ন করিলেও শোধিত হয়। রসক একমাস কাল নরমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে, সেই রসক দ্বারা শুদ্ধ পারদ তাম্র ও রৌপ্য বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় রঞ্জিত হয়।

হরিদ্রা, ত্রিফলা, ধূনা, সৈন্ধব, গৃহধূম, সোহাগা ও ভেলা প্রত্যেক চতুর্থাংশ পরিমিত, এইসকল দ্রব্য এবং কাঁজির সহিত খর্পর মর্দ্দন করিয়া তাহা বেগুনের মূষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক লেপন করিবে।

শুষ্ক হইলে সেই মূষার মুখ বন্ধ করিবে এবং অপর একটি মূষায়

তাহা স্থাপিত করিয়া হাপরে পোড়াইবে। মূষা মধ্যস্থ খর্পর গলিয়া যখন নীল ও শ্বেত শিখা উদ্গত হইবে, তখন সাঁড়াশী দ্বারা সেই মূষা অধোমুখে ধরিয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে আস্ফালন করিবে, যেন সেই বেগুনের মূষা ভাঙ্গিয়া না যায়। এইরূপে রসক হইতে বঙ্গের ন্যায় স্বত্ব নিঃসৃত হয়। তিন চারিবার এইরূপ দগ্ধ করিলে তাহার সমুদায় সত্ত্ব নিঃসৃত হইয়া পড়ে। হরীতকী, লাক্ষা, কেঁচো, হরিদ্রা, গৃহধূম ও সোহাগা এইসকল দ্রব্যের সহিত রসক মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষারুদ্ধ করিয়া হাপরে দগ্ধ করিলেও রসকের শুদ্ধসত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা লাক্ষা, গুড়, শ্বেতসর্ষপ, হরীতকী, হরিদ্রা, ধুনা ও সোহাগার সহিত রসক চূর্ণ করিয়া গোদুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত তাহা পাক করিবে। তৎপরে তাহার গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া বেগুনের মূষা মধ্যে রুদ্ধ ও পুনঃপুনঃ হাপরে দগ্ধ করিয়া শিলাপাত্রে ঢালিবে। এইরূপে বঙ্গের ন্যায় মনোহর সত্ত্ব নিঃসৃত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে। এই রসক সত্ত্ব ও হরিতাল খর্পরে রাখিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিবে এবং লৌহ দণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে তাহাতে সেই সত্ত্ব ভস্মীভূত হইবে। এই ভস্ম সমপরিমিত কান্তলৌহ ভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা আট রতি পরিমানে লইবে। ত্রিফলার ক্বাথে তিল তৈল প্রক্ষেপ দিয়া তাহা এক রাত্রি কান্ত লৌহপাত্রে রাখিতে হইবে, তৎপরে ঐ ক্বাথ সহ ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে মধুমেহ, পিত্ত বিকৃতি, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, গুল্ম, সোমরোগ, বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, হিক্কা এবং স্ত্রীদিগের রক্তগুল্ম, প্রদর, যোনিব্যাপদ ও রজঃশূল নিবারিত হয়।

গৈরিক

গৈরিক দুই প্রকার। পাষাণগৈরিক ও স্বর্ণগৈরিক।

কঠিন ও তাম্রবর্ণ গৈরিককে পাষাণ গৈরিক কহে আর যাহা অত্যন্ত রক্তবর্ণ স্নিগ্ধ ও মসৃণ, তাহার নাম স্বর্ণ গৈরিক। স্বর্ণ গৈরিক স্বাদু, স্নিগ্ধ, শীতল, কষায়রস নেত্ররোগে হিতকর, রক্ত দুষ্টি নাশক এবং

রক্তপিত্ত, হিক্কা, বমি ও বিষদোষ নিবারক। পাষাণগৈরিক স্বর্ণগৈরিক অপেক্ষা অল্পগুণ বিশিষ্ট। গোদুগ্ধের ভাবনা দ্বারা গৈরিক শোধিত হয়। ক্ষার ও অম্ল দ্বারা ক্লিন্ন করিলে, গৈরিক হইতে সত্ত্ব নির্গত হয়। গৈরিক সত্ত্ব পারদের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহা অধিক গুণশালী হইয়া থাকে। গৈরিক, পাংশুলবর্ণ, শুঁঠ, বচ, কটফল এবং কাঁজি, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিবে। উক্ত প্রলেপ ত্রিদোষ এবং সান্নিপাতিক জ্বরোৎপন্ন কর্ণমূল জাত শোথে বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। পিত্তোল্বন জ্বরে গৈরিক কেবল মধু সংযোগে কিংবা পারদ, গন্ধক ও মধু সহ ব্যবহার্য্য। ইহা ধনে, বেনারমূল ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ অনুপান করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়। কিম্বা এলাইচ, চিনি, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা ও হরীতকী গৈরিক এবং রসাঞ্জন ইহাদিগকে একত্র মর্দ্দন করিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া চক্ষে অঞ্জনবৎ ব্যবহার করিলে যাবতীয় চক্ষুরোগ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রক্তচন্দন, লাক্ষা, মালতীকলিকা একত্রে মলম করিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে নেত্রব্রণ নষ্ট হয়। কাঁজিসহ সিকি তোলা পরিমিত গৈরিক দিবসে চারিবার সেবন করিলে শীতপিত্ত রোগ নষ্ট হয়। পাকা তেঁতুল ও গৈরিক একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে যাবতীয় শীতপিত্ত ও উদর্দ্দ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। সিকিতোলা পরিমাণে গৈরিক জলসহ সেবন করিলে পিত্তজ ব্যাধি নষ্ট হয়।

পিত্ত বিকৃতি জনিত বিসর্প ও চর্ম্মরোগে গৈরিক, ঘৃত সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শরীরে কোন স্থান দগ্ধ হইলে, ইহা নারিকেল তৈল ও ঘৃত সহ প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয় ও ক্ষত হইতে পারে না। আমের আঁঠিরশস্য চূর্ণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কটফল ইহাদের সহিত গৈরিক একত্র জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে যোনি কণ্ডু নিবারিত হয়।

কাসীস—(হীরাকস)

কাসীস দুইপ্রকার—বালুকাকাসীস ও পুষ্পকাসীস। বালুকা ও পুষ্প উভয় কাসীসই ক্ষার পদার্থ, অম্লরস, অগুরু ধূমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বিষনাশক, শ্বিত্র নিবারক ও কেশরঞ্জক। তন্মধ্যে পুষ্প-কাসীস অধিক প্রসিদ্ধ। ইহা উষ্ণবীর্য্য কষায় অম্লরস, নেত্রের অত্যন্ত হিতকর, কেশরঞ্জক এবং বিষদোষ, শ্বিত্র, ক্ষয়, ব্রণ ও বাতশ্লেষ্মজ রোগ সমূহের বিনাশ কারক।

একবার ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিলেই হীরাকস শোধিত হয়। তুবরী হইতে সত্ত্ব আকর্ষণের নিয়মানুসারে কাসীসের সত্ত্ব আহরণ করিতে হয়। পিত্ত দ্বারা ভাবনা দিলেও কাসীস শোধিত হইয়া থাকে।

গন্ধক জারিত কাসীস এবং কাসীস জারিত বৈক্রান্ত উভয় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ চুর্ণ এবং সমপরিমিত ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে শ্বিত্র, পাণ্ডু ক্ষয়, গুল্ম, প্লীহা, শূল, বিশেষতঃ অর্শরোগও শীঘ্র বিনষ্ট হয়। রসায়ন বিধি অনুসারে ইহা এক বৎসরকাল সেবনে আমদোষ শোধিত হয়, মন্দ অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং বলিপলিতাদি নিশ্চিতই নিবারিত হয়।

তুবরি—(সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা)

সৌরাষ্ট্র দেশের প্রস্তর হইতে তুবরী (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা) নামক মসৃণ মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। ইহা বস্ত্রে লেপন করিলে, বস্ত্র মঞ্জিষ্ঠা রাগ রঞ্জিতের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়। পীতিকা ফুল্লিকা নামক আর এক প্রকার তুবরী আছে। তন্মধ্যে পীতিকা (কাঠখড়ি) ঈষৎ পীতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, বিষনাশক, এবং ব্রণ ও সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগের উপকারক। ফুল্লিকা শুক্লবর্ণ, ভারশূন্য, স্নিগ্ধ ও অম্লরস যুক্ত। এই ফুল্ল তুবরী তাম্রে লেপন করিলে তাম্র লৌহের আকার ধারণ করে।

তুবরীর অপরনাম কাঙ্ক্ষী। ইহা কটু, কষায়, অম্লরস যুক্ত, কণ্ঠ শোধক কেশের হিতকর, ব্রণনাশক, বিষনিবারক, শ্বিত্র নাশক, নেত্রের উপকারী ত্রিদোষের উপশমকারক, এবং পারদের জারণ কার্য্যে উপযোগী।

তুবরী তিনদিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়, এবং ক্ষার ও অম্লবর্গের সহিত মর্দ্দন করিয়া হাপরে দগ্ধ করিলে ইহার সত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা ইহাকে গোপিত্ত দ্বারা শতবার ভাবনা দিয়া শোধন করিবে এবং তৎপরে হাপরে দগ্ধ করিয়া ইহার সত্ত্ব পাতন করিবে।

কঙ্কুষ্ঠ

হিমালয়ের প্রচণ্ড শিখর হইতে কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। কঙ্কুষ্ঠ দুই প্রকার ; নলিকা কঙ্কুষ্ঠ ও রেণুক কঙ্কুষ্ঠ। তন্মধ্যে নলিকা কঙ্কুষ্ঠ পীতবর্ণ গুরু ও স্নিগ্ধ এবং ইহাই উৎকৃষ্ট ; রেণুক কঙ্কুষ্ঠ শ্যাম-পীতবর্ণ, লঘু ও সত্ত্বহীন, ইহা নিকৃষ্ট।

কেহ কেহ বলেন সদ্যোজাত হস্তীর বিষ্ঠা হইতে শ্যাম পীতবর্ণ কঙ্কুষ্ঠ উৎপন্ন হয় ইহা বিরেচক। অপর কেহ কেহ বলেন তেজিবাহর নাল শ্বেত-পীতবর্ণ কঙ্কুষ্ঠরূপে পরিণত হয়। তাহা অত্যন্ত বিরেচক, সত্ত্বহীন, বহু বিকারজনক এবং রসক্রিয়া ও রসায়ন কার্য্যে অনুপযোগী।

কঙ্কুষ্ঠ কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, অতি বিরেচক এবং ব্রণ, উদাবর্ত্ত, শূল গুল্ম, প্লীহা ও অর্শ প্রভৃতি রোগনাশক।

সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড় হুড়ে), কদলীমূল, বন্ধ্যা কর্কোটকী (তেত কাঁকরোল), কোশাতকী (ঘোষালতা), দেবদালী, শজিনা ছাল, বন্য ওল, নিরঙ্কনা বা নীরকনা ওকাকমাচী, এই সকল দ্রব্যের এক একটির রস দ্বারা এবং লবণক্ষার ও অম্ল দ্রব্য দ্বারা বহুবার ভাবনা দিলে কঙ্কুষ্ঠ প্রভৃতি রস ও উপরস সমূহ শোধিত হয়। আর ঐ সকলেরই ভাবনা দিয়া আঘ্রাত করিলে সমুদায় উপরসেরই সত্ত্ব নির্গত হইয়া থাকে। শুঁঠীর কাথ দ্বারা

তিনবার ভাবনা দিলেও কঙ্কুষ্ঠ শোধিত হয়। কঙ্কুষ্ঠ সত্ত্বময়, এইজন্য ইহার সত্ত্বাকর্ষণের বিধান নির্দ্দিষ্ট নাই।

বিরেচনযোগ্য ব্যক্তির বিরেচনের জন্য এক যব মাত্রায় কঙ্কুষ্ঠ মল-রোধক দ্রব্যের সহিত সেবন করিবে, তাহাতে ক্ষণকাল মধ্যে শরীরের আমপূর্ণতা বিনষ্ট হয়। তাম্বুলের সহিত ইহা ভক্ষণ করিলে, বিরেচন হইয়া প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কঙ্কুষ্ঠ সেবনে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে, সেই বিষ নাশের জন্য বাবলা মূলের ক্বাথের সহিত সমপরিমিত জীরা ও সোহাগা বারংবার সেবন করা আবশ্যক।

স্ফটিক—

তুরবী সত্ত্ব স্ফটিক নামে অভিহিত। ইহা অগ্নিতে গলাইয়া লইলেই শোধিত হয়। স্ফটিক ব্রণ, উরুক্ষত ও শূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট করিয়া থাকে। ইহা পারদের জারণ কার্য্যে সাহায্য করে। ইহা দেখিতে উৎকৃষ্ট সৈন্ধব লবণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট।

সাধারণ রস।

কম্পিল্ল, গৌরীপাষাণ, নবসার, কপর্দ্দক, অগ্নিজার, গিরিসিন্দুর, হিঙ্গুল ও মৃদ্দারশৃঙ্গ এই আট প্রকার সাধারণ রস। নাগার্জ্জুনপ্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে রসের অন্তর্ভুক্ত বলেন।

কম্পিল্ল :—কম্পিল্লক (কমলাগুঁড়ি) ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় ও বহু চন্দ্রিকা (চাকচিক্য) বিশিষ্ট। ইহা অত্যন্ত বিরেচক। কম্পিল্ল সৌরাষ্ট্র দেশে উৎপন্ন হয়। পিত্ত, ব্রণ, আধ্মান, মল-মূত্রাদির বিবন্ধ, শ্লেষ্মা, উদর-রোগ, ক্রিমি, গুল্ম, অর্শ, আমদোষ, শোথ, জ্বর ও শূল প্রভৃতি বিরেচন সাধ্য সমুদায় রোগ ইহাদ্বারা বিনষ্ট হয়।

গৌরীপাষাণ :—পীত, বিকট ও হতচূর্ণক নামভেদে গৌরী-পাষাণ তিন প্রকার। ইহাদের মধ্যে হতচূর্ণক স্ফটিকবৎ, বিকট শঙ্খের ন্যায় এবং পীত হরিদ্রাবর্ণ। হতচূর্ণক অপেক্ষা বিকট এবং বিকট অপেক্ষা পীত গৌরীপাষাণ অধিক গুণশালী। গৌরীপাষাণ করোলা ফলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া, হাড়ীতে করিয়া সিদ্ধ করিলে বিশোধিত হয়। হরি-তালের সত্ত্ব আকর্ষণের নিয়মানুসারে ইহার সত্ত্ব আকর্ষণ করিতে হয়। গৌরীপাষাণের শুদ্ধ সত্ত্ব শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, দোষ নাশক এবং পারদের বন্ধন কারক ও বীর্য্য বর্দ্ধক।

নবসার :—বাঁশের অঙ্কুর বা পীলুকাষ্ঠ পচিলে, তাহা হইতে যে ক্ষার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই নবসার কহে। ইহার অপর নাম চূলিকা লবণ। দগ্ধ ইষ্টকে যে শ্বেতবর্ণ লঘু লবণবৎ পদার্থ জন্মে, তাহাও নবসার বা চুলিকা লবণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নবসার, পারদের জারণ কারক, ধাতু সমুহের দ্রাবণ কারক, জঠরাগ্নির বৃদ্ধি কারক এবং গুল্ম, প্লীহা, মুখশোষ, এবং ত্রিদোষের বিনাশক। ইহা সেবন করিলে ভুক্ত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া থাকে। চুলিকালবণ বিড়দ্রব্য (রসজারণ) মধ্যে পরিগণিত।

কপর্দ্দক :—যে বরাটিকা (কপর্দ্দক) পীতাভ, পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থি-বিশিষ্ট এবং দীর্ঘবৃত্তাকৃতি, সেই বরাটিকাই রসবৈদ্যগণ রসকার্য্যে নির্দ্দেশ করেন। ইহার অপর নাম চরাচর। সার্দ্ধনিষ্ক অর্থাৎ ৬ ছয় মাষা পরিমিত বরাটিকা উৎকৃষ্ট, নিষ্ক (চারি মাষা) পরিমিত মধ্যম এবং নিষ্কের এক অংশ কম অর্থাৎ তিন মাষা পরিমিত হইলে, সেই বরাটিকা নিকৃষ্ট। বরাটিকা পরিণামাদি শূলনাশক, গ্রহণী ও ক্ষয়রোগ নিবারক এবং কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নির দীপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও বাতশ্লেষ্ম নাশক। ইহা পারদ জারণে প্রশস্ত এবং বিড়দ্রব্য মধ্যে পরি-গণিত। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ যুক্ত বরাটিকা ভিন্ন অন্যান্য বরাটিকা গুরু ও

পিত্তশ্লেষ্মজনক। এক প্রহরকাল কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিলে বরাটিকা শোধিত হয়।

অগ্নিজার :—অগ্নিনক্রের জরায়ু সাগর তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্থলে পতিত হইলে এবং রৌদ্র তাপে শুষ্ক হইয়া গেলে, তাহা অগ্নিজার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অগ্নিজার ত্রিদোষ নাশক, ধনুঃস্তম্ভাদি বাতব্যাধি নিবারক। পারদের বীর্য্য বর্দ্ধক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক ও জীর্ণকর। ইহা সমুদ্রের ক্ষার জলে পূর্ব্বেই শুদ্ধ হয়, এই জন্য ইহার শোধন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

গিরিসিন্দূর :—মহাগিরির পাষাণ গর্ভে রক্তবর্ণ ও শুষ্ক যে অল্প পরিমিত রস পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই গিরিসিন্দূর নামে নির্দ্দিষ্ট। গিরিসিন্দূর ত্রিদোষ নাশক, ভেদক, রসবন্ধনে প্রশস্ত, দেহের দৃঢ়তাসাধক এবং নেত্রের হিতকর।

হিঙ্গুল :—হিঙ্গুল দুই প্রকার—শুকতুণ্ড ও হংস পাক। ইহাদের মধ্যে শুকতুণ্ড অল্প গুণশালী, ইহা চর্ম্মার নামে অভিহিত হয়। আর যাহা প্রবালবর্ণ কিন্তু শ্বেতরেখা বিশিষ্ট, তাহারই নাম হংসপাক। হিঙ্গুল সর্ব্বদোষ নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, অতিশয় রসায়ন, সকল রোগ নিবারক, বৃষ্য এবং জারণ ক্রিয়ার অতি প্রশস্ত। হিঙ্গুল হইতে যে পারদ নিঃসৃত করিয়া লওয়া হয়, তাহা জীর্ণগন্ধক পারদের সহিত সমান গুণ বিশিষ্ট।

হিঙ্গুলের শোধন বিধি—

১। আদার রসে অথবা মান্দারের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে হিঙ্গুল নির্দ্দোষ হয়।

২। হিঙ্গুল স্বভাবতই সুন্দর রক্তবর্ণ, মেষদুগ্ধ ও অম্লবর্গ দ্বারা সাত

বার ভাবিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহা উৎকৃষ্ট কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং বিশুদ্ধ হয়।

৩। হিঙ্গুলকে তিনদিন জয়ন্তী পাতার রসে, অথবা কাঁজিতে অথবা গোমূত্রে অথবা লেবুর রসে দোলাযন্ত্রে পাক করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুলের সত্ত্ব পাতন

জলবিশিষ্ট পাতন যন্ত্রে হিঙ্গুল পাতিত করিলে তাহা হইতে পারদ রূপ সত্ত্ব নির্গত হয়।

হিঙ্গুল হইতে রসাকর্ষণ বিধি—

(১) হিঙ্গুল তণ্ডুলবৎ ক্ষুদ্র করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে অথবা আমরুল শাকের রসে তিনদিন পুনঃ পুনঃ (সাতবার) ভাবনা দিবে। পরে একটি হাঁড়ীতে উহা স্থাপন করিয়া গোড়ালেবুর রসে ও আমরুল শাকের রসে প্লাবিত করিবে। তদনন্তর একখানি সরার পশ্চাদ্‌ভাগ খড়ি দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহা হাড়ীর মুখে স্থাপন করতঃ সন্ধিস্থল উত্তমরূপে লিপ্ত করিবে এবং উর্দ্ধপাতন যন্ত্র বিধানে ঐ হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল ও শরাবের উপরে জলদিবে। জল উষ্ণ হইলে তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতলজল দিবে এইরূপে ত্রিশবার জলপরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ায় নিম্ন ভাণ্ডস্থ পারদ দোষমুক্ত হইয়া খটিকালিপ্ত শরার তলদেশে সংলগ্ন হইবে। শীতল হইলে সন্ধিস্থল উদ্‌ঘাটিত করিয়া খটিকা সংযুক্ত পারদ সংগ্রহণ পূর্ব্বক কাপড়ে ছাঁকিয়া জলে বা কাঁজিতে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া লইবে।

(২) পারদ প্রসঙ্গে হিঙ্গুল হইতে অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য রসাকর্ষণ বিধি লিখিত হইয়াছে।

অশুদ্ধ হিঙ্গুল সেবন জনিত দোষ—

অশুদ্ধ হিঙ্গুল সেবন করিলে কুষ্ঠ, ক্লৈব্য, ক্লম, ভ্রম, মোহ ও মস্তিষ্কের বিকৃতিজনিত নানা প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া থাকে।

অশুদ্ধ হিঙ্গুল সেবন জনিত দোষের শান্তি—

যোগ্য পরিমিত (সিকি তোলা হইতে অর্দ্ধ তোলা) বিশুদ্ধ গন্ধক দুগ্ধ সহ সেবন করিলে অশুদ্ধ হিঙ্গুল সেবন জনিত দোষের শান্তি হয়।

ভূনাগ।

বর্ষা ও শরৎ কালে বৃষ্টি ক্লিন্ন মৃত্তিকা হইতে ভূনাগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার মৃত্তিকা জাত ক্রিমি বিশেষ। ভূনাগ চারি প্রকার। স্বর্ণখনি নিকটস্থ মৃত্তিকাজাত ভূনাগ, রৌপ্য খনি নিকটস্থ মৃত্তিকা জাত ভূনাগ, লৌহখনি নিকটস্থ মৃত্তিকাজাত ভূনাগ এবং তাম্রখনি নিকটস্থ মৃত্তিকাজাত ভূনাগ। প্রথমোক্ত তিন প্রকার ভূনাগ দুর্লভ ও চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ তাম্রখনি নিকটস্থ ভূনাগ সুলভ।

সামান্য ভূমিজাত ভূনাগ অল্পগুন বিশিষ্ঠ। অম্লসংযুক্ত ক্ষার জলে একদিন সিদ্ধ করিলে ভূনাগ শোধিত হয়।

ভূনাগের সত্ত্ব পাতন—

(১) শরৎ কালজাত ভূনাগকে মাৎগুড়, মধু, ঘৃত, সোহাগা, কদলী কন্দ ও শূরণ (ওল) সহ একত্র মর্দ্দন করিয়া একটি তাল পাকাইবে। পরে উক্ততাল শুষ্ক করিয়া যে পর্য্যন্ত না সত্ত্ব নির্গত হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে আধ্মাপিত করিবে। এই সত্ত্ব কিট্ট অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া লইবে।

(২) দুগ্ধ সহ সিদ্ধ করিয়া, ভূনাগ-মৃত্তিকা দ্বারা কিম্বা সোহাগা দ্বারা মর্দ্দন করিবে। তৎপরে আধ্মাপিত করিলে উহা হইতে সত্ত্ব নিঃসৃত হয়। ভূনাগসত্ত্ব শীতগুণবিশিষ্ট। ইহা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ও ব্রণ নষ্ট করে। ইহা জলসহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ স্থাবর ও জঙ্গমবিষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহা পারদকে অগ্নিসহনক্ষম করে। ইহা ময়ূরপুচ্ছ সত্ত্ব সদৃশ গুণবিশিষ্ট।

মৃদ্দারশৃঙ্গক :—গুর্জ্জর দেশে অর্ব্বুদ গিরির পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে মৃদ্দারশৃঙ্গক উৎপন্ন হয়। ইহা সীসকসত্ত্বের ন্যায় গুরু, শ্লেষ্মানাশক, শুক্র-রোগনাশক, পারদের বন্ধনক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট এবং উত্তম কেশরঞ্জন।

মাতুলুঙ্গের রস ও আদার রস দ্বারা তিন রাত্রি ভাবিত করিয়া শুষ্ক করিলে, মৃদ্দার শৃঙ্গক এবং অন্যান্য সাধারণ রস দোষশূন্য হয়। যে যত প্রকার সত্ত্ব আছে, তৎসমুদায়ই শুদ্ধিবর্গোক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আধ্মাত করিলে শোধিত হয় এবং পরস্পর মিশ্রিত হইয়া থাকে।

রাজাবর্ত্ত :—রাজাবর্ত্ত অল্প রক্ত এবং বহুল পরিমাণে নীলিমা মিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট। যে রাজাবর্ত্ত গুরু ও মসৃণ তাহাই শ্রেষ্ঠ; ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইলে তাহা মধ্যম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজাবর্ত্ত প্রমেহ, ক্ষয়, অর্শ, পাণ্ডু, শ্লেষ্মরোগ ও বায়ুরোগ নিবারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বৃষ্য ও রসায়ন।

লেবুর রস, গোমূত্র ও ক্ষার পদার্থের সহিত দুই তিনবার সিন্ন করিলে রাজাবর্ত্তাদি ধাতুসমূহ বিশুদ্ধ হয়। শিরীষ ফুল ও আদার রস দ্বারাও রাজাবর্ত্ত শোধিত হইয়া থাকে।

রাজাবর্ত্ত চূর্ণ করিয়া মাতুলুঙ্গের রস ও গোমূত্রের সহিত মাড়িয়া সাতবার পুটপাক করিলে মৃত হয়। রাজাবর্ত্ত চূর্ণের সহিত মনঃশিলা চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, মহিষ দুগ্ধের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিবে; তৎপরে সোহাগা ও পঞ্চগব্যের সহিত পিণ্ডিত করিয়া ইহা জারিত

করিবে। তৎপরে খদির কাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা ধ্মাপিত করিলে রাজাবর্ত্তের অতি সুন্দর সত্ত্ব নিঃসৃত হয়।

এই নিয়মে গৈরিকও শোধিত হয়, এবং তাহার পাত ও রক্তবর্ণের সুন্দর সত্ত্ব নির্গত হয়।

অঞ্জন

অঞ্জন পাঁচ প্রকার। সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন, পুষ্পাঞ্জন, ও নীলাঞ্জন। সৌবীরাঞ্জন ধূম্রবর্ণ, শীতল, রক্তপিত্তনাশক, বিষ, হিক্কা ও নেত্ররোগ নিবারক ও ব্রণের শোধন ও রোপণকারক। রসাঞ্জন পীতাভ ও পুষরোগ নাশক, শ্বাস, হিক্কা নিবারক, বর্ণবর্দ্ধক ও বায়ু, পিত্ত ও রক্তের বিনাশকারক। স্রোতোঞ্জন শীতল, স্নিগ্ধ, কষায়রস, স্বাদু, লেখনকারক, চক্ষুর হিতকর এবং হিক্কা, বিষ, বমন, কফ, পিত্ত ও রক্তবিকৃতির নিবারণ কারক। পুষ্পাঞ্জন শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ নাশক, অতি দুর্জ্জয় হিক্কারও নিবারণকারক এবং বিষ ও জ্বরনাশক। নীলাঞ্জন গুরু, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকর, ত্রিদোষ নাশক, রসায়ন, স্বর্ণমারক ও লৌহের মৃদুতাকারক।

ভৃঙ্গরাজের স্বরস ভাবনাদিলে অঞ্জন সকল শোধিত হয়, মনঃশিলার সত্ত্বপাতন নিয়মানুসারে সকল প্রকার অঞ্জনের সত্ত্ব আকর্ষণ করিতে হয়।

স্রোতোঞ্জনের আকৃতি বল্মীক শিখরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে তাহাতে নীলোৎপলের আভা লক্ষিত হয় এবং ঘর্ষণ করিলে গৈরিমাটীর ন্যায় বর্ণ দেখা যায় এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ করিয়া স্রোতোঞ্জন গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে গোময় রস, গোমূত্র, ঘৃত, মধু ও বসার সাতবার ভাবনা দিবে। এই স্রোতোঞ্জন দ্বারা পারদ শীঘ্র বদ্ধ হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তের ভাবনা দিলেও রসাঞ্জন শোধিত হয়। রাজাবর্ত্ত হইতে সত্ত্বপাতনের নিয়মানুসারেও স্রোতোঞ্জনের সত্ত্বপাতন করিতে পারা যায়।

হরিতাল

সোমল ও গন্ধক সংযোগে হরিতাল প্রস্তুত হয়। হরিতাল চারি প্রকার; বংশপত্র হরিতাল, পিণ্ড হরিতাল, গোদন্ত হরিতাল, ও বকদাল হরিতাল। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত গোদন্ত হরিতাল ও বকদাল হরিতাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

বংশপত্র হরিতাল :—ইহা স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। গুরু, স্নিগ্ধ, মৃদু, চাকচিক্যশাল, এবং সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম স্তরবিশিষ্ট। ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি ও জরানাশক এবং রসায়ন।

পিণ্ড হরিতাল :—ইহা নিষ্পত্র, পিণ্ডাকার, অল্প সত্ত্ববিশিষ্ট এবং গুরু। ইহা বিশেষরূপে স্ত্রীদিগের রজঃনাশক এবং অন্যবিধ হরিতাল অপেক্ষা হীনগুণ সম্পন্ন।

গোদন্ত হরিতাল :—ইহা দীর্ঘ খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা অতি স্নিগ্ধ এবং গোদন্তের ন্যার আকৃতি বিশিষ্ট। ইহা গুরু এবং ইহার মধ্যে হরিৎ ও নীলবর্ণের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়।

বকদাল হরিতাল :—বকদাল হরিতাল অতি মৃদু এবং অত্যন্ত হিমগুণসম্পন্নতা হেতু হিমহরিতাল নামে খ্যাত। ইহা পত্রযুক্ত, গুরু, শ্বেতকুষ্ঠ এবং অন্যবিধ সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠের নিবারক।

শোধিত হরিতালের গুণ :—বিশুদ্ধ হরিতাল, শ্লেষ্মা, রক্তদুষ্টি, বাতরক্ত, বিষ, বায়ুপ্রকোপ, ও ভূতদোষ নাশ করিয়া থাকে।

ইহা স্ত্রীপুষ্প নাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কটু, দীপক, কুষ্ঠনাশক ও অগ্নিবৰ্দ্ধক।

মারণযোগ্য হরিতাল :—ভস্ম করিবার নিমিত্ত বংশপত্র হরিতালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পিণ্ড হরিতাল ভস্মার্থে প্রযোজ্য নহে। কর্কটরোগ ও গলৎ-কুষ্ঠ অপহরণ করিবার নিমিত্ত গোদন্ত হরিতাল শ্রেষ্ঠ। শ্বিত্র নাশ করিবার জন্য বকদাল হরিতাল ভস্ম প্রযোজ্য।

অশুদ্ধ হরিতাল সেবন জনিত শোষ :—অশুদ্ধ হরিতাল আয়ুনাশক কফ, বায়ু ও প্রমেহ কারক এবং শোথ, বিস্ফোটক ও অঙ্গসঙ্কোচ কারক। যে হরিতাল যথার্থরূপে শোধিত ও ভস্মীভূত হয় নাই, তাহা সেবনে দেহ সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় এবং নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং হরিতালকে প্রথমে যথাশাস্ত্র শোধন করিয়া ভস্ম করিবে। ভস্মীভূত হরিতাল সর্ব্বরোগ নাশক।

হরিতালের শোধন বিধি।

১। কুষ্মাণ্ড জলে অথবা তিলক্ষার জলে অথবা চূণের জলে দোলা যন্ত্রে একদিন পাক করিলে হরিতাল শোধিত হইয়া থাকে।

২। চূনের জলে সাতদিন ভাবনা দিলে বংশপত্র হরিতাল শুদ্ধ হয়।

৩। হরিতালকে কাঁজি মিশ্রিত চূনের জলে, কুষ্মাণ্ড জলে, তিল তৈলে এবং ত্রিফলার কাথে দোলা যন্ত্রে তিন ঘণ্টা পাক করিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

হরিতাল ভস্মের সহজ বিধি।

১। বিশুদ্ধ হরিতাল গ্রহণ করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডীভূত করিবে। তাহার পর ঐ পিণ্ডকে একটী অন্ধ মূষায় বন্ধ করিবে। তাহার পর উহাকে বারপ্রহর কাল তীব্র অগ্নিতে গজপুটে পাক করিবে। ছয়বার এইরূপে ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দন করিয়া, ছয়বার পুটপাক করিলে হরিতাল ভস্মীভূত হয়।

২। শোধিত হরিতালকে ৭ দিন অশ্ববিষ্ঠার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। তাহার পর উহাকে অশ্ববিষ্ঠার অগ্নিতে ৫ বার গজ পুটে পাক করিলে উহা ভস্মীভূত হয়।

৩। একটি ফাঁপা মানুষের হাড় সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যে শোধিত হরিতাল চূর্ণ পূর্ণ করিবে। তাহার পর ঐ ফাঁপা নলের দুই দিক অশ্বত্থ, পলাশ অথবা পুনর্ণবার ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিবে। তাহার পর উহাকে গজপুটে একদিন তীব্রঅগ্নিতে পাক করিবে। এইরূপে যে হরিতাল ভস্ম প্রস্তুত হয় তাহা অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বরোগ নাশক।

হরিতাল ভস্মের পরীক্ষা :—হরিতাল ভস্ম অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি তাহা হইতে ধূম নির্গত না হয় তবেই তাহাকে বিশুদ্ধ হরিতাল ভস্ম বলিয়া জানিবে।

হরিতাল ভস্মের গুণ ও প্রয়োগ :—দ্বাদশ রতি পরিমিত ইক্ষুগুড় অনুপানে অৰ্দ্ধরতি পরিমিত হরিতাল ভস্ম সেবন করিলে আশীপ্রকার বায়ুরোগ, চল্লিশ প্রকার পিত্তরোগ, কুড়ি প্রকার শ্লেষ্মারোগ, যাবতীয় কুষ্ঠ, মেহ ও গুহ্যপ্রদেশস্থ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ইহা শ্বাসে, কাসরোগে, ক্ষয়ে, কুষ্ঠে, পিত্তজরোগে সান্নিপাতিক রোগে, দদ্রু, পামা, ব্রণ ও বাতরোগে প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

হরিতাল ভস্মের অনুপানবিধি :—সর্ব্বপ্রকার রক্ত বিকারে আমআদার রস অনুপানে হরিতাল ভস্ম সেব্য। অপস্মার রোগে বিষ ও জীরাসহ ইহা ব্যবহার্য্য। সমুদ্রফল যোগে হরিতাল ভস্ম সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জলোদর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা

ঘোষালতার রস অনুপানে ভগন্দর, মঞ্জিষ্ঠাকাথ সহযোগে ফিরঙ্গরোগ, ত্রিফলা ও শর্করাযোগে পাণ্ডুরোগ ও শুঁঠচূর্ণ সহ আমবাত নষ্ট করিয়া থাকে।

স্বর্ণভস্ম অনুপানযোগে ইহা ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত, কাঁটানটের রস সহ সেবনে অষ্টবিধ জ্বর বিনাশ হইয়া থাকে।

মঞ্জিষ্ঠা, বাকুচি, চক্রমর্দ্দ, নিম্ব, হরিতকী, আমলকী, বাসা, শতাবরী, বলা, নাগবলা, যষ্ঠিমধু, কোকিলাক্ষ বীজ, পটোল পত্র, বেণার মূল, গুলঞ্চ এবং রক্তচন্দন ইহাদের কাথ অনুপানে হরিতাল ভস্ম সেবন করিলে আঠার প্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়। ইহা ছাড়া অনুপান ভেদে সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশক।

হরিতালসেবীর পথ্য :—হরিতালসেবী অম্ল, লবণ, কটুরস অগ্নিতাপ এবং রৌদ্রসেবা পরিত্যাগ করিবেন। যিনি একান্ত লবণ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি অতি অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিবেন। মিষ্ট দ্রব্য ভোজন হরিতালসেবীর পক্ষে উপকারী।

হরিতালের সত্ত্বপাতনবিধি—

১। কুলুত্থকলায়ের কাথ, সোহাগা, মহিষীঘৃত এবং মধু ইহাদিগের দ্বারা হরিতাল মর্দ্দন করতঃ একটি স্থালীর মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরে উক্ত স্থালীটি একটি ছিদ্র বিশিষ্ট শরাবদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। তৎপরে স্থালীটিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত অগ্নিতে সম্যকরূপে পাক করিবে। এক প্রহরকাল আচ্ছাদিত শরাবের ছিদ্রগুলিকে গোময় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। অতঃপর তিনঘণ্টা কাল পাক করার পর আচ্ছাদিত গোময় উদ্ঘাটিত করিয়া ছিদ্রগুলি খুলিয়া দিবে। যখন ঐ ছিদ্র সমূহ হইতে পাণ্ডুবর্ণ ধূম নির্গত হইতে থাকিবে তখন অগ্নির জ্বাল বন্ধ করিয়া দিবে।

পরে উক্ত স্থালীটি সম্পূর্ণ শীতল হইয়া হইলে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং অতি সাবধানে স্থালীস্থিত সত্ত্ব গ্রহণ করিবে।

২। একপল হরিতাল অর্কদুগ্ধসহ একদিন মর্দ্দন করিবে এবং ইহার সহিত উহার ষোলগুণ তৈল মিশ্রিত করিবে। তৎপর ইহাকে অনাবৃত পাত্রে স্থাপন করতঃ একুশ ঘণ্টা কাল জ্বাল দিবে। পরে পাত্রটী যখন সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে তখন উহার তলদেশ সংলগ্ন বিশুদ্ধ সত্ত্ব গ্রহণ করিবে।

৩। তির্য্যক্‌যন্ত্রে হরিতালকে পাতিত করিলে উহা হইতে শ্বেত বর্ণ হরিতাল সত্ত্ব পাতিত হয়। ইহা সেবন করিলে আশ্চর্য্যরূপে জ্বর ও অজীর্ণ নিবারিত এবং কান্তি, পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়। মাত্রা ১ সর্ষপ।

৪। এরণ্ড ও জয়পাল বীজের সহিত মর্দ্দন করিয়া বালুকা যন্ত্রে পাক করিলে হরিতালের সত্ত্ব বহির্গত হয়।

হরিতাল সত্ত্বের প্রয়োগবিধি :—এক তণ্ডুল পরিমিত হরিতাল সত্ত্ব সেবনে দুঃসাধ্য বাতরক্ত দুই সপ্তাহ মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে। হরিতাল সত্ত্ব ব্যবহার কালে রোগী লবণ ত্যাগ করিয়া ঘৃত সংযুক্ত অন্ন ও রুটি লুচি ব্যবহার করিবেন।

অশুদ্ধ হরিতাল সেবনজন্য দোষের শান্তি :—

১। অর্দ্ধতোলা জীরা চূর্ণ ও অর্দ্ধ তোলা চিনি শীতল জল সহ তিন দিন সেবন করিলে অশুদ্ধ হরিতাল সেবন জন্য দোষ নিবারিত হয়।

২। রাজহংস অথবা কুষ্মাণ্ডের রস ৭ দিন /০ ছটাক পরিমাণ পান করিলে উক্ত দোষ নিবারিত হয়।

মনঃশিলা।

মনঃশিলা হরিতালের প্রকার ভেদ মাত্র। হরিতাল পীতবর্ণ, মনঃশিলা রক্তবর্ণ। মনঃশিলা তিন প্রকার; শ্যামাঙ্গী, কণবীরকা ও খণ্ডা।

রক্তগৌরযুক্ত শ্যামবর্ণ এবং ভারবহুল মনঃশিলার নাম শ্যামা মনঃশিলা। যাহা গৌরশূন্য, তাম্রবৎ, রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল, তাহাই কণবীরকা ! যে মনঃশিলাকে চূর্ণ করিলে অতিশয় রক্তবর্ণ ও অধিক ভার বিশিষ্ট হয় তাহাকে খণ্ড মনঃশিলা কহে। ইহারা উত্তরোত্তর অর্থাৎ শ্যামা অপেক্ষা কণবীরা এবং কণবীরা অপেক্ষা খণ্ড মনঃশিলা গুণবিষয়ে উৎকৃষ্ট এবং অধিক সত্ত্বযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মনঃশিলা একটী শ্রেষ্ঠ রসায়ন। ইহা কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফবাত নাশক, অধিক সত্ত্বযুক্ত এবং ভূতদোষ, বিষ, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ডু, কাস, ও ক্ষয়রোগের নিবারক।

অশোধিত মনঃশিলা সেবনের দোষ :— অশোধিত মনঃশিলা, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য ও মলরোধ উৎপাদন করে। শুদ্ধ মনঃশিলা সর্ব্বরোগ নাশক।

মনঃশিলার শোধন বিধি :—বকফুলের পাতার রস অথবা আদার রস দ্বারা সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা শোধিত হয়। জয়ন্তীপত্র, ভৃঙ্গরাজ ও রক্তবকফুলের পত্রের রস সহ এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে পুনর্ব্বার ও ছাগমূত্রের সহিত এক প্রহর দোলাযন্ত্রে পাক করিবে এবং কাঁজি দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। এইরূপেও মনঃশিলা শোধিত হইয়া থাকে। অথবা কেবল মাত্র চূণের জলে সাত দিন ভাবনা দিলেও মনঃশিলা শোধিত হয়। শুদ্ধ মনঃশিলা সকল রোগে প্রয়োগ করিবে।

মনঃশিলার সত্ত্ব আকর্ষণ বিধি ঃ—গুড়, গুগ্‌গুলু ও ঘৃতের সহিত তাহাদের অষ্টমাংশ পরিমিত মনঃশিলা মর্দ্দন পূর্ব্বক কোষ্ঠিকাযন্ত্রে রুদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে আধ্মাত করিলে অর্থাৎ হাপরে পোড়াইলে, মনঃশিলার সত্ত্ব নির্গত হয়। অথবা সীসকসত্ত্ব, সোহাগা ও মদনফলের সহিত হরিতাল মিশ্রিত করিয়া কদলীপত্রের রস সহ মর্দ্দন

করিবে এবং মুষারুদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিবে। তৎপরে ক্ষার ও অম্লদ্রব্যের সহিত পেষণ করিয়া দুই ঘণ্টা আধ্মাত করিবে। এইরূপে মনঃশিলার সত্ত্ব নির্গত হয়।

স্বর্ণ

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, দস্তা, বঙ্গ ও সীসক এই সাতটি শুদ্ধ ধাতু। পিত্তল, কাংস্য ও বর্ত্তলৌহ এই তিন প্রকার মিশ্রধাতু। ধাতু, লৌহ ও লুহ তিনটি শব্দ একার্থবাচী। ধাতুমাত্রেই বলিপলিত, খালিত্য, কার্শ্য, দৌর্ব্বল্য, জ্বর ও জরা নাশ করিয়া দেহ রক্ষা করে।

স্বর্ণ

প্রকৃত স্বর্ণকে গলাইলে রক্তবর্ণ ধারণ করে, ছেদন করিলে রৌপ্যবর্ণ ধারণ করে এবং কষ্টিপ্রস্তরে ঘষিলে কুঙ্কুম সদৃশ বর্ণ ধারণ করে। মলবিহীন স্বর্ণ স্নিগ্ধ, কোমল, গুরু এবং উৎকৃষ্ট। যে স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, মলযুক্ত, দলবিশিষ্ট এবং যাহা গলাইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং কষ্টিপ্রস্তরে ঘষিলে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে তাহা লঘু, ক্ষণভঙ্গুর এবং পরিত্যজ্য।

স্বর্ণের প্রকার ভেদ :—স্বর্ণ প্রধানতঃ দুই প্রকার—রসেন্দ্রবেধজ ও খনিজ। রসেন্দ্রবেধজ স্বর্ণ—ষোড়শবিধ বর্ণবিশিষ্ট। খনিজ স্বর্ণ—চতুর্দ্দশবিধ বর্ণবিশিষ্ট। প্রথমবিধ স্বর্ণ—রসায়ন, জরানাশক ও শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়বিধ স্বর্ণকে যথাশাস্ত্র ভস্মীভূত করিলে তাহা সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

শোধিত স্বর্ণের গুন :—

১। সাধারণতঃ সকল স্বর্ণই আয়ুঃ, লক্ষ্মী, কান্তি, বুদ্ধিও স্মৃতির বৃদ্ধিকর, নিখিল রোগনাশক, পবিত্র, ভূতাবেশের শান্তিকর, রতি শক্তি

বর্দ্ধক, সুখজনক, পুষ্টিকর, জরানিবারক, মেহনাশক, ক্ষীণগণের পুষ্টি বর্দ্ধক, মেধাজনক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। রোপ্যও প্রায় এই সকল গুণ বিশিষ্ট।

২। রসেন্দ্র বেধজ অর্থাৎ পারদের সংমিশ্রণ দ্বারা যে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই রসেন্দ্র বেধজ স্বর্ণ কহে। ইহা রসায়ণ, উপকারিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পবিত্র।

স্বর্ণ স্নিগ্ধ, পবিত্র, বিষদোষনাশক, পুষ্টিকর, অত্যন্ত বৃষ্য, যক্ষ্মা ও উন্মাদ প্রভৃতি শারীর রোগ নাশক, মেধাবুদ্ধি ও স্মৃতি বর্দ্ধক, সুখজনক, সর্ব্বদোষ, ও সকল রোগনিবারক, রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, বেদনা নিবারক এবং মধুর বিপাক।

অশোধিত ও অমাড়িত স্বর্ণের দোষ—অশুদ্ধ ও অজারিত স্বর্ণ সেবনে বীর্য্য, বল ও সুখ বিনষ্ট হয় এবং বহুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব স্বর্ণ শোধিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

স্বর্ণের শোধন বিধি—সম পরিমিত স্বর্ণপত্র ও লবণ একত্র শরাব মধ্যে রুদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ প্রহর কাল অঙ্গারাগ্নিতে আধ্মাপিত করিলে, তাহা পূর্ণবর্ণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

২। স্বর্ণ, রোপ্য, পিতল, তাম্র এবং লৌহকে উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার তৈলে, তক্রে, গোমূত্রে, কাঁজিতে এবং কুলথ কলায়ের ক্বাথে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

৩। সর্ব্বপ্রকার ধাতুকে সাতবার উত্তপ্ত করিয়া কলার এঁটের রসে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

ধাতু মারণে পারদের আবশ্যকতা—সমুদয় ধাতুরই পারদভস্মমিশ্রণে যে মারণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল বিশেষের স্বরসাদি দ্বারা মারণ ক্রিয়া সম্পাদিত করিলে তাহা মধ্যম বলিয়া অভিহিত হয়। আর গন্ধকাদিদ্বারা যে মারণ ক্রিয়া নিষ্পাদন করা হয় তাহাকে নিকৃষ্ট বলা যায়। অরি-লৌহ অর্থাৎ বিরুদ্ধ গুণান্বিত ধাতুদ্বারা যে কোন ধাতুর মারণ ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইলে, তাহা অপকারী হইয়া থাকে।

যে ধাতুভস্ম পারদ ব্যতিরেকে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা সেবন করিলে উদরে কীট জন্মিয়া থাকে—ইহা সিদ্ধ লক্ষ্মীশ্বর প্রমুখ রসাচার্য্যের বাণী।

স্বর্ণভস্ম বিধি—১। অতি পাত্‌লা স্বর্ণ পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা পারদ ভস্ম ও মাতুলুঙ্গ লেবুর রসে লিপ্ত করিবে। শুষ্ক হইলে যথানিয়মে পুট দিবে। এইরূপ দশবার পুট দিলেই স্বর্ণ মারিত হয়।

২। স্বর্ণ দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে স্বর্ণের সমপরিমিত পারদভস্ম নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে তাহা চূর্ণ করিয়া, মাতুলুঙ্গের রস ও হিঙ্গুলের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুট পাক করিবে। এইরূপে দ্বাদশবার পুটদিলে কুঙ্কুমবর্ণ স্বর্ণভস্ম প্রস্তুত হয়।

৩। স্বর্ণের চতুর্থাংশ পারদভস্ম কোন অম্লদ্রব্যের সহিত পেষণ করিয়া, তাহা স্বর্ণপত্রে লেপন করিবে এবং শুষ্ক হইলে পুটপাক করিবে। এইরূপ আটবার পুটপাক করিলেই স্বর্ণভস্ম হয়।

বিনা অগ্নি যোগে স্বর্ণভস্ম বিধি—

৪। এক ভাগ পারদ দুই ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া তিন ভাগ শোধিত স্বর্ণপত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ৬ ঘণ্টা কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক একটি তাল পাকাইবে। তাহার পর উক্ত তালটিকে

এরণ্ডপত্রে উত্তমরূপে বন্ধন করিবে। তাহার পর উহাকে একটি তামার পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া এক ঘণ্টাকাল রৌদ্রে রাখিবে। রৌদ্রে থাকিয়া উক্ত পিণ্ডটি উত্তপ্ত হইলে উহাকে শরাব সম্পুটে বদ্ধ করিয়া তিনদিন ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। চতুর্থ দিবসে উহাকে বাহির করিয়া চূর্ণ করতঃ সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণই স্বর্ণের নিরুত্থ ভস্ম। ইহা এত পাত্‌লা যে জলে ভাসিয়া থাকে। এই ভস্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

স্বর্ণের দ্রুতি—১। ভেকের অস্থি ও বসা এবং সোহাগা করবীর ও ইন্দ্রগোপ কীট এই সমস্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া রাখিলে বহুকাল পর্য্যন্ত স্বর্ণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

২। ইন্দ্রগোপকীট চূর্ণ ও দেবদালী (ঘোষাবিশেষ) ফলের স্বরস একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার ভাবনা দিলে স্বর্ণ জলবৎ দ্রবীভূত হয়।

স্বর্ণভস্মের অনুপান—দুইরতি পরিমিত স্বর্ণভস্ম মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, পাণ্ডু, গ্রহণীদোষ, সর্ব্ববিধ বিষদোষ ও দূষীবিষ নিবারিত হয়। ইহা ওজোধাতু বর্দ্ধক, বলকর এবং পথ্য।

শোথে :—মৎস্যপিত্তের সহিত সেব্য।

বলবৃদ্ধি করণে :—ভৃঙ্গরাজের রস ও দুগ্ধসহ সেব্য।

চক্ষুরোগে :—পুনর্ণবার রস।

রসায়নে :—ঘৃতসহ।

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করণে :—বচচূর্ণ সহ।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করণে :—কুঙ্কুমসহ সেব্য।

যক্ষ্মারোগে :—দুগ্ধসহ।

বিষদোষে :—বিশল্য করণীর রস সহ সেব্য।

উন্মাদে :—শুঁঠ, লবঙ্গ ও মরিচ চূর্ণসহ।

রৌপ্য।

রৌপ্যের প্রকার ভেদ—

রৌপ্য তিন প্রকার; সহজ, খনিজ ও কৃত্রিম। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অর্থাৎ কৃত্রিম অপেক্ষা খনিজ এবং খনিজ অপেক্ষা সহজ রৌপ্য অধিক গুণ বিশিষ্ঠ।

কৈলাসাদি পর্ব্বত হইতে যে রৌপ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সহজ রজত কহে। এই রৌপ্য একবার স্পর্শ করিলেই মনুষ্যগণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া থাকে।

হিমালয়াদি পর্ব্বত শিখরে যে রৌপ্য উৎপন্ন হয় ধাতুতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে খনিজ রৌপ্য বলেন। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন।

যে রৌপ্য পারদ হইতে উৎপন্ন হয় তাহার নাম কৃত্রিম রৌপ্য! ইহা যথানিয়মে প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বরোগ নাশ করিয়া থাকে।

যে রৌপ্য ঘন, স্বচ্ছ, গুরু, স্নিগ্ধ, কোমল, শঙ্খবৎ শুভ্রবর্ণ, মসৃণ, স্ফোটকহীন অর্থাৎ বুদবুদাকৃতি এবং দগ্ধ বা ছেদন করিলেও যাহার শুভ্রবর্ণ বিকৃত না হয়, সেই রৌপ্যই শুভফলপ্রদ।

যে রৌপ্য দগ্ধ করিলে রক্তপীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং যাহা রুক্ষ, স্ফুটন, লঘু, স্থূলাঙ্গ ও কর্কশাঙ্গ, এই অষ্টবিধ রৌপ্য পরিত্যাজ্য অর্থাৎ ইহা ব্যবহারে অপকার হইয়া থাকে।

রৌপ্য অম্লকষায় রস, বিপাকে মধুর, শীতল সারক, অত্যন্ত লেখন কারক, রুচিজনক, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মা নাশক. জঠরাগ্নির দীপ্তি কারক, অত্যন্ত বলকর, বয়ঃস্থাপক ও মেধাজনক।

পাঠান্তরোক্ত রৌপ্যগুণ, রৌপ্য, শীতল, অম্লকষায় রস, স্নিগ্ধ, বায়ু নাশক, গুরুপাক এবং রসায়ন বিধানে প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বরোগ নাশক হয়।

স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর পাত, এক একবার উত্তপ্ত করিয়া তিলতৈল, তক্র (ঘোল), গোমূত্র, কাঁজি ও কুলত্থের ক্বাথ এই সকল দ্রব পদার্থে যথাক্রমে সাতবার নিষিক্ত করিলে শোধিত হয়।

অশোধিত রৌপ্য, আয়ুঃ, শুক্র ও বলনাশ করে এবং সন্তাপ ও মলরোধ রোগ উৎপাদন করে ; অতএব তাহাকে যথাশাস্ত্র শোধিত ও ভস্মীভূত করিবে।

১। সীসক ও সোহাগার প্রক্ষেপ দিয়া রৌপ্য গলাইলে সেই রৌপ্য শোধিত হয়।

রৌপ্যে, অন্যবিধ শোধন বিধি স্বর্ণশোধনের ন্যায়।

রৌপ্যভস্মবিধি—স্বর্ণ ভস্মের ন্যায় রৌপ্য ভস্ম করিবে। স্বর্ণভস্মের চতুর্থ বিধি দ্রষ্টব্য।

রৌপ্যের দ্রুতি—দেবদালী (ঘোষা) ফলে সাতবার নর-মূত্রের ভাবনা দিয়া সেই দেবদালী ফলের প্রক্ষেপ দিলে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ই দ্রবীভূত হয়।

রৌপ্যভস্মের প্রয়োগ—সর্ব্বসমষ্টির সমপরিমিত ত্রিকটু ও ত্রিফলা চূর্ণ এবং ঘৃত মধুর সহিত ইহা উপযুক্ত মাত্রায় লেহণ করিলে যক্ষ্মা, পাণ্ডু, উদর রোগ, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, নেত্ররোগ ও সর্ব্ববিধ পিত্ত-বিকার প্রশমিত হয়।

রৌপ্য ভস্মের প্রয়োগ।

শোথে—চিনির সহিত সেব্য।
বায়ু ও পিত্ত বৃদ্ধিতে—ত্রিফলা চূর্ণ সহ সেব্য।
প্রমেহে—ত্রিসুগন্ধি চূর্ণ সহ সেব্য।
গুল্মে—যবক্ষার চূর্ণ সহ সেব্য।

কাসে—শ্লেষ্মাধিক্যে—বাসকের রস ও ত্রিকটু চূর্ণ সহ সেব্য।
শ্বাসে—ভার্গী ও শুঁঠ চূর্ণ সহ সেব্য।
ক্ষয়ে—শিলাজতু ভস্ম সহ সেব্য।
কার্শ্যে—মাংস রস অথবা দুগ্ধ সহ সেব্য।
প্লীহা ও যকৃতে—ত্রিফলা ও পিপুল চূর্ণ সহ সেব্য।
জলোদরে—পুনর্ণবার রস সহ সেব্য।
রক্তাল্পতায়—লৌহ ভস্ম সহ সেব্য।
রসায়ণে ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করণে এবং অগ্নিবৃদ্ধি করণে } ঘৃতসহ সেব্য।

তাম্র।

তাম্র দুই প্রকার, ম্লেচ্ছ ও নেপাল ; তন্মধ্যে নেপাল তাম্রই উৎকৃষ্ট। নেপাল দেশ ব্যতীত অপর দেশের খনি হইতে যে সকল তাম্র উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ম্লেচ্ছ তাম্র কহে। যে তাম্র শ্বেত বা কৃষ্ণের আভাযুক্ত অরুণবর্ণ কঠিন ও অত্যন্ত বমনকারক, যে তাম্র পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে তাহাই ম্লেচ্ছ তাম্র। আর যে তাম্র স্নিগ্ধ, মৃদু, রক্তবর্ণ, গুরু আঘাতেও ভাঙ্গিয়া যায় না, গুরু (ভারী) ও অবিকৃত তাহাকেই নেপাল তাম্র কহে। নেপালতাম্র উৎকৃষ্ট গুণশালী।

পাণ্ডুবর্ণ অথবা কৃষ্ণযুক্ত অরুণবর্ণ, লঘু, স্ফুটনযুক্ত (ফাটাফাটা) রুক্ষাঙ্গ ও স্তর বিশিষ্ট তাম্র রসক্রিয়ায় প্রশস্ত নহে।

তাম্র ঈষৎ অম্লযুক্ত কষায় তিক্তরস, বিপাকে মধুর, উষ্ণবীর্য্য, পিত্ত-শ্লেষ্ম নাশক, উর্দ্ধ ও অধোদেহের শোধন কারক, স্থূলতা নাশক, ক্ষুধা-বর্দ্ধক, নেত্ররোগে হিতকর, লেখন এবং বিষদোষ, যকৃতের দোষ, জঠর রোগ, কুষ্ঠ, আমদোষ, ক্রিমি, অর্শ, ক্ষয় ও পাণ্ডু রোগের উপশম কারক।

অশোধিত ও অমারিত তাম্র আয়ুঃক্ষয়কারক, কান্তি, বীর্য্য ও বল নাশক এবং বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম; উৎক্লেদ (বমনবেগ) কুষ্ঠ ও শূল রোগের উৎপাদক।

তাম্র সেবনে উৎক্লেদ, মলভেদ, ভ্রম, দাহ ও মোহ এই কয়েকটি দোষ অতি প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাম্র শোধিত হইলে ঐ সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায় এবং রস বীর্য্য ও পাকে সুধার ন্যায় হিতকর হয়।

তাম্রের শোধন বিধি।

ক্ষার ও অম্ল পদার্থ এবং গৈরিকের সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া বন-ঘুঁটের অগ্নিতে তাহা দ্রবীভূত করিবে এবং মহিষী দুগ্ধের তক্রে নিক্ষেপ করিবে। সাতবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে তাম্রের উৎক্লেদাদি পঞ্চ-দোষ নষ্ট হইয়া যায়। অথবা নির্ম্মল তাম্রপাত্রে লেবুর রস ও সৈন্ধব-লবণ লেপন করিয়া তাহা আধ্মাপিত করিবে ও সৌবীরক কাঁজিতে নিক্ষেপ করিবে। আটবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে তাম্র শোধিত হয়। তাম্রপাত্রে লেবুর রস ও সৈন্ধব লবণ লেপণ করিয়া উত্তপ্ত করিবে এবং নিসিন্দার রসে তাহা নিমগ্ন করিবে। এইরূপ আটবার উত্তপ্ত করিয়া নির্ব্বাপিত করিলেও তাম্র শোধিত হইয়া থাকে।

তাম্রের ভস্ম বিধি।

গোমূত্রের সহিত তাম্রপত্র এক প্রহর কাল তীব্র অগ্নিতে পাক করি-করিলেও তাহা বিশোধিত হয়। পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া জামী-রের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, তদ্বারা তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে এবং তাহা শরাবে রুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। এইরূপ তিনবার করিলে তাম্র ভস্মীভূত হয়।

মারিত তাম্রের অমৃতী করণ।

মারিত তাম্র কোন এক প্রকার অম্লরসে মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে এবং সেই গোলক ওলের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া ওলের উপর মৃত্তিকা-লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে গজপুটে তাহা দগ্ধ করিয়া সেই তাম্র গ্রহণ করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার পর সেই তাম্র সেবন করিলে কদাচ বমন, ভ্রম ও বিরেচন হয় না।

সূক্ষ্ম তাম্রপত্র প্রথমতঃ পাঁচ প্রহর কাল গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সেই তাম্রপত্র একভাগ, পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ একত্র আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া ভাণ্ডে রুদ্ধ করিবে। অতঃপর সেই ভাণ্ডের নীচে এক প্রহর কাল অগ্নি জ্বাল দিলে তাম্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই তাম্রপত্র সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, হরিতাল অর্দ্ধভাগ এবং মনঃশিলা সিকিভাগ একত্রে উত্তমরূপে মসৃণ কজ্জলী করিবে। তৎপর যন্ত্রোধ্যায়োক্ত গর্ভযন্ত্র মধ্যে সেই কজ্জলী ও পারদের সমপরিমিত তাম্র পর্য্যায় ক্রমে নিহিত করিবে। অর্থাৎ প্রথমে কিঞ্চিৎ কজ্জলী রাখিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ তাম্র এবং তাহার উপর আবার কজ্জলী ও কজ্জলীর উপর আবার তাম্র এইরূপ সজ্জিত করিয়া একপ্রহর কাল তাহা যথানিয়মে পাক করিবে। পাক শেষে যন্ত্র শীতল হইলে তাহা হইতে তাম্র গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে।

এই তাম্রভস্ম দুইরতি মাত্রায় উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে পরিণাম শূল, উদররোগ, শূল, পাণ্ডু, জ্বর, গুল্ম, প্লীহা যকৃৎ, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, অর্শোরোগ ও গ্রহণীরোগ নিশ্চিত নিবারিত হয়। **ইহাকে সোমনাথ তাম্র কহে।**

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, তাম্রপত্র দুইভাগ একত্র ঘৃত

কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহা একটি ভাণ্ডে রাখিবে এবং ভাণ্ডের মুখে একটি শরা আচ্ছাদন দিবে। সেই ভাণ্ডটি একটি হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিয়া লবণ দ্বারা সেই হাঁড়ি পূর্ণ করিবে। এবং হাঁড়ির মুখেও একখানি শরা আচ্ছাদন দিবে। তৎপরে চারিপ্রহর কাল তাহাকে অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে। সেই তাম্র চূর্ণ করিয়া দুইরতি মাত্রায় মধু ও পিপুল চূর্ণের সহিত সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রযুক্ত হইলে ইহা গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, মূর্চ্ছা, ধাতুগত জ্বর, পরিণামশূল এবং ত্রিদোষ জনিত সমুদয় রোগ বিনষ্ট করে। রসক্রিয়া এবং রসায়ন কার্য্যে ও উপযুক্ত মাত্রায় এই তাম্র ভস্ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আদার রস ও মধু সংযোগে দুইরতি তাম্রভস্ম সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ নিবারিত হয়। তাম্র সর্ব্বপ্রকার উদর রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বিনা অগ্নিযোগে তাম্রের নিরুত্থ ভস্ম

একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক একত্রে কজ্জলী করিয়া তিনভাগ শোধিত তাম্রের উপর নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর ঐ সকল দ্রব্য গুলিকে লেবুর রসে তিনদিন ভিজাইয়া রাখিবে। তিনদিন গত হইলে দেখিবে তাম্র গলিয়া পঙ্কবৎ হইয়াছে। তাহার পর ঐ তাম্রকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এই প্রকার যে তাম্রভস্ম পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বরোগ নাশক। ইহা বিশেষভাবে রসায়ন গুণ সম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ নাশক।

লৌহ

"আয়ুঃপ্রদাতা বলবীর্য্যকর্ত্তা রোগাপহর্ত্তা মদনস্য ধাতা।
অয়ঃ সমানং নহি কিঞ্চিদস্তি রসায়নং শ্রেষ্ঠতমং নরাণাম॥"

লৌহ তিন প্রকার ঃ—মুণ্ড, তীক্ষ্ণ ও কান্ত।

মুণ্ড লৌহ তিন প্রকার ঃ—মৃদু, কুণ্ঠ ও কড়ার; যাহা শীঘ্র দ্রবীভূত হয়, স্ফোটকের ন্যায় বুদ বুদ যুক্ত হয় না এবং যাহা চিক্কণ তাহাই **মৃদু মুণ্ডলোহ**। ইহা শুভ ফলপ্রদ। যে মুণ্ডলৌহে আঘাত করিয়া অনায়াসে প্রসারিত করা যায় না তাহাকে কুণ্ঠ কহে, ইহা মধ্যম, আর যাহা আহত হইলে ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভগ্ন হইলে কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহা কড়ার মুণ্ড। উৎকৃষ্ট মৃদু মুণ্ড লৌহ সেবনে কফ, বায়ু, শূল, মূলরোগ, আমদোষ, মেহ, কামলা. পাণ্ডু, গুল্ম, আমবাত, উদররোগ ও শোথ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নির উদ্দীপক, রক্তবর্দ্ধক ও কোষ্ঠশুদ্ধি কারক।

তীক্ষ্ণ লৌহ

তীক্ষ্ণলৌহ ছয় প্রকার ঃ—খর, সার, হৃন্নাল, তারাবট্ট, বাজির ও কাললৌহ। যে তীক্ষ্ণলৌহ পরুষ (খরস্পর্শ) পোগর শূন্য (অর্থাৎ অলকের ন্যায় কুটীল রেখাহীন) যাহা ভাঙ্গিলে পারদের ন্যায় আভা দৃষ্ট হয় এবং নমিত করিতে গেলে ভগ্ন হইয়া যায়, তাহাকে খরলৌহ কহে। যে লৌহের উপর তীব্রবেগে আঘাত করিলে তাহার প্রান্তভাগ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা সারলৌহ। সারলৌহ কুটিল রেখাযুক্ত এবং পাণ্ডু ভূমিজাত। যে লৌহ পাণ্ডু কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চু বা বীজাকৃতি, পোগর যাহার গাত্রে স্পষ্টরূপে থাকে এবং যাহা ছেদন করিতে অতি কঠিন বোধ হয় তাহাই হৃন্নাল লৌহ। বজ্রাকৃতি এবং সূক্ষ্ম ২ রেখা বিশিষ্ট পোগর দ্বারা যে লৌহের গাত্র অবিরল ব্যাপ্ত এবং যাহা শ্যামবর্ণ তাহাকে বাজির লৌহ কহে। আর যে লৌহ নীলকৃষ্ণবর্ণ, সান্দ্র, মসৃণ, গুরু, উজ্জ্বল এবং লৌহের আঘাত করিলেও ভাঙ্গিয়া যায় না তাহাই কাললৌহ বা কালায়স।

খরলৌহ রুক্ষ বিপাকে ঈষৎ মধুর, নাতিশীতোষ্ণ বীর্য্য, তিক্তরস এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, উদর, প্লীহা ও আমদোষ এবং পাণ্ডুরোগের উপশম কারক। শূল, যক্বত, ক্ষয়, জরা, মেহ, আমবাত, অর্শ, ও দাহরোগ ইহার দ্বারা সদ্যঃ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নির উদ্দীপক, অত্যন্ত রসায়ন ও বলকর।

কান্তলৌহ

কান্তলৌহ পাঁচ প্রকার :—যথা ভ্রামক, চুম্বক, কর্ষক, দ্রাবক, ও রোমকান্ত। এই সকল লৌহের মধ্যে কোন লৌহ একমুখ, কোনও দ্বিমুখ, কেহ ত্রিমুখ, কেহ চতুর্ম্মুখ, কেহ বা পঞ্চমুখ, কেহ বা সর্ব্বতোমুখ। এই পঞ্চবিধ লৌহের পীত, কৃষ্ণ ও রক্ত এই তিন প্রকার বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পীত বর্ণ লৌহ স্পর্শবেধী কার্য্যে, কৃষ্ণবর্ণ লৌহ রসায়ন কার্য্যে উৎকৃষ্ট এবং রক্তবর্ণ লৌহ পারদের বন্ধন ক্রিয়ায় প্রশস্ত। ভ্রামক লৌহ নিকৃষ্ট, চুম্বক মধ্যম, কর্ষক উত্তম, এবং দ্রাবক অতি উত্তম। যে কান্তলৌহ অপর লৌহসমূহ ঘূর্ণিত করে তাহাই ভ্রামক; যাহা লৌহকে চুম্বন করে অর্থাৎ লৌহের সহিত সংলগ্ন হইয়া যায় তাহাই চুম্বক, যে লৌহ অপর লৌহকে আকর্ষণ করে তাহা কর্ষক; যাহা অন্যান্য লৌহকে দ্রবীভূত করিতে পারে তাহা দ্রাবক; এবং যে লৌহ গাত্রে স্ফুটিত হইলে রোমোদ্গম হয় তাহা রোমকান্ত লৌহ। একমুখ লৌহ নিকৃষ্ট, দ্বিমুখ ও ত্রিমুখ লৌহ মধ্যম, চতুর্ম্মুখ ও পঞ্চমুখ উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বতোমুখ লৌহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভ্রামক ও চুম্বক লৌহ ব্যাধিনাশে প্রশস্ত। কর্ষক এবং দ্রাবক লৌহ রসে এবং রসায়ন কার্য্যে হিতকর। রোমকান্ত লোহ পারদের বন্ধন ক্রিয়ায় অতি উৎকৃষ্ট। খনি হইতে যত্নপূর্ব্বক লৌহ সংগ্রহ করা উচিত। যে লৌহ রৌদ্রে ও বাতাসে পতিত হইয়া থাকে তাহা বর্জ্জনীয়।

কান্ত লৌহের স্বরূপ

যে লৌহের পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে সেই তৈলবিন্দু প্রসৃত হয় না, যাহার গাত্রে হিং লেপন করিলে তাহার গন্ধ এবং নিম্বকল্ক লেপন করিলে তাহার তিক্তাস্বাদ নষ্ট হইয়া যায় এবং যাহাতে দুগ্ধপাক করিলে দুগ্ধ শিখরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে অথচ মাটিতে পড়িয়া যায় না তাহাকে কান্ত লৌহ কহে। ইহা ভিন্ন অপর লক্ষণযুক্ত লৌহ কান্তলৌহ নহে। কান্তলৌহ রসায়ন কার্য্যে অতি উৎকৃষ্ট। সুস্থ ব্যক্তির দীর্ঘায়ুঃপ্রদ, স্নিগ্ধ, মেহনাশক, ত্রিদোষের শান্তিকারক, তিক্তরস, নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, শূল, আমদোষ, মূলরোগ (অর্শ), গুল্ম, প্লীহা, উদর, পাণ্ডু, যক্বত, ক্ষয়, প্রভৃতি নানারোগ নাশক। যোগবশে ইহা সমুদয় রোগেরই নাশক। সকলপ্রকার ঔষধ কল্পের মধ্যে লৌহ কল্পই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব সর্ব্বাগ্রে লৌহের মারণ ও শোধনক্রিয়া বিশেষ যত্নের সহিত সম্পন্ন করিবে।

লৌহের শোধন বিধি

১। লোহ সামুদ্র লবণের দ্বারা লেপন করিবে এবং উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে লৌহের গিরিজ দোষ নষ্ট হয়।

২। তেঁতুল ফল বা পত্র সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে অথবা গোমূত্রে ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে উত্তপ্ত লৌহ পত্র নিক্ষেপ করিলেও তাহা শোধিত হইয়া থাকে।

৩। স্বর্ণ শোধনের নিয়মানুসারেও লৌহ শোধিত হইয়া থাকে।

লৌহভস্ম বিধি।

১। লৌহ ভস্মের বিধি স্বর্ণ ভস্মের ন্যায়। স্বর্ণ ভস্মের চতুর্থ বিধি দ্রষ্টব্য।

২। তীক্ষ্ম লৌহের চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পিষ্ঠ তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া চাকী প্রস্তুত করিবে। চাকী গুলি শুষ্ক হইলে পুটপাক করিতে হইবে। এইরূপে পাঁচবার পুটপাক করিলে রক্তবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত হয়।

৩। তীক্ষ্ম লৌহের স্তরহীন পাত প্রস্তুত করিয়া তাহা তীব্র অগ্নিতে আধ্মাপিত করিবে এবং জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে প্রস্তরের উদূখলে স্থূল লৌহদণ্ডের আঘাত দ্বারা সেই লৌহপাত চূর্ণ করিবে, তাহার মধ্যে যেগুলি স্থূল খণ্ড থাকিবে তাহা দুইখানি সরার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার দগ্ধ করিবে ও জলে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ স্ফুটিত করিয়া চূর্ণ করিবে সেই চূর্ণ পারদ ও গন্ধকের দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া বিংশতিবার পুটপাক করিবে। প্রত্যেকবার পুটপাকের পর দৃঢ়রূপে পেষণ করিতে হইবে। এইরূপে ভস্মীভূত লৌহ সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

৪। লৌহচূর্ণ ও তাহার সমপরিমাণ গন্ধক একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তিনবার পুটপাক করিলেই লৌহ ভস্মরূপে পরিণত হইবে।

৫। লৌহ উত্তপ্ত করিয়া হিঙ্গুল মিশ্রিত জামীরের রসে নিক্ষেপ করিলে লৌহ ভস্মরূপে পরিণত হয়। একবারে না হইলে কয়েকবার ঐ রূপ করিবে।

যে লৌহপাত্রস্থিত জলে তৈল বিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা বিক্ষিপ্ত হয় না, অপিচ তারাকারে আবর্ত্তিত হয়, তাহাই কান্ত লৌহ। সর্ব্বলৌহ শ্রেষ্ঠ সেই কান্ত লৌহের পাতলা পাত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। এবং ত্রিফলার ক্বাথে তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে সেই শুদ্ধলৌহ কোন অম্লপদার্থের সহিত পেষণ করিয়া তাহার সহিত চতুর্থাংশ পরিমিত মৃত পারদ মিশ্রিত করিবে ও অগ্নিতে পুটপাক করিবে। অথবা

সমপরিমিত স্বর্ণ, মাক্ষিক, গন্ধক ও পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুট দিবে। অথবা কান্তলৌহে ক্ষার ও অম্ল পদার্থ লেপণ পূর্ব্বক উত্তপ্ত করিয়া শশকের রক্তে নির্ব্বাপিত করিবে; ইহাতেও কান্তলৌহ শোধিত হইয়া সর্ব্বদোষশূন্য হয়। শোধিত পারদ ও তাহার দ্বিগুণ পরিমিত গন্ধক একত্রে খলে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে এবং সেই কজ্জলী এবং কজ্জলীর সম-পরিমিত লৌহচূর্ণ একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। সেই গোলক কাংস্যপাত্রে রাখিয়া এবং তাহার উপর এরণ্ডপত্র আচ্ছাদন করিয়া অর্দ্ধ প্রহরকাল পাক করিবে। পাকের পর তিনদিন তাহা ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তৎপরে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে লৌহের যে ভস্ম প্রস্তুত হয়, তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসিয়া থাকে। কান্ত তীক্ষ্ম ও মুণ্ড এই ত্রিবিধ লৌহেরই এইরূপে নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয়। লৌহের ন্যায় স্বর্ণাদি ধাতুর চূর্ণ করিয়াও এইরূপে ভস্ম প্রস্তুত করা যায়। কান্ত লৌহ কমনীয় কান্তিজনক, পাণ্ডুরোগ নাশক, যক্ষ্মারোগ নিবারক, বিষ নাশক, ত্রিদোষের শান্তি কারক, বিবিধ কুষ্ঠ নাশক, বলকর, বৃষ্য, বয়ঃ, স্থাপক, সর্ব্বব্যাধি নাশক, উৎকৃষ্ট রসায়ণ এবং অদ্বিতীয়, পার্থিব অমৃত স্বরূপ। ইহা সেবনে ক্রিমি বিকার, পাণ্ডু, বায়ুরোগ, ক্ষীণতা, পিত্তরোগ স্থূলতা, অর্শ, গ্রহণী, জ্বর, শ্লেষ্মবিকার, শোথ,প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, বিষদোষ, কুষ্ঠ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। ইহা স্বাস্থ্য জনক, রসায়ন ও অকাল মৃত্যু নাশক। মৃতলৌহ রসবৎহিতকর, যোগানুগারে ইহা মহাব্যাধি নিবারক। লৌহভস্ম সেবন অভ্যাস করিলে দেহের দৃঢ়তা লাভ হয় এবং জরাব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পারদ বিহীন লৌহ ভস্মের দোষ অপনয়ন

যে লৌহকে পারদ ব্যতীত ভস্ম করা হইয়াছে তাহাকে তাহার একের তিন অংশ পারদ ও পারদের দ্বিগুণ গন্ধক দ্বারা ছয়ঘণ্টা কাল ঘৃতকুমারীর

রসে মর্দ্দন করিবে। তাহার ঐ সমস্ত দ্রব্যকে লঘুপুটে পাক করিলে উহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

লৌহ ভস্মের পরীক্ষা।

ঘৃত ও মধু মিশ্রিত লৌহ ভস্মকে রৌপ্য সম্পুটে রুদ্ধ করিবে,তাহারপর তাহাকে প্রবল অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিবে, উত্তপ্ত হইলে যদি রৌপ্যের আকার পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে লৌহ যথার্থ রূপে ভস্ম হয় নাই। উহাকে পুনরায় লৌহে পরিণত করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে লৌহকে পুনরায় ভস্ম করিতে হইবে। মৃত লৌহকে পঞ্চামৃতের সহিত (মধু, ঘৃত, গুঞ্জা, সোহাগা এবং গুগ্ গুল) ভাজিয়া লইলে আর উহা কোনরূপেই পূর্ব্ববৎ লৌহে পরিণত হইতে পারে না।

লৌহ ভস্মের অমৃতী করণ :—তুল্য পরিমাণ ঘৃতের সহিত লৌহ ভস্ম লৌহপাত্রে উত্তপ্ত করিবে। ঘৃত মরিয়াগেলে নামাইয়া রাখিবে। এইরূপে লৌহের অমৃতীকরণ সাধিত হয়। ইহা যোগবাহী।

লৌহ পুটে প্রয়োজনীয় দ্রব্য :—ত্রিফলা, শিগ্রু, হস্তিকর্ণপলাশ, ভৃঙ্গরাজের এবং পুনরায় ত্রিফলার ক্বাথে লৌহকে মর্দ্দন করতঃ পুটপাক করিলে ইহা কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মায় না। ইহা পিপুলের ক্বাথে মর্দ্দন করতঃ ব্যবহার করিলে অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করে। সেইরূপ ভূমিকুষ্মাণ্ড রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ব্যবহারে ধ্বজভঙ্গ, লেবুর রস সহ মর্দ্দনে ক্ষুধামান্দ্য, শিরিষ ছালের ক্বাথ সহ মর্দ্দনে ব্যবহার করিলে বিবর্ণতা নষ্ট হয়; লৌহ বলারস সহযোগে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিলে বাত, পক্ষাঘাত ও যাবতীয় বায়ু বিকৃতি নষ্ট হইয়া থাকে। পিত্ত বিকৃতিতে ক্ষেত্রপর্পটী রস সহ, ত্রিদোষ প্রকোপে দশমূলের ক্বাথ সহ, বিষম জ্বর (ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর) কিরাত তিক্তের রসে, মেহে গুড়চী রস সহ, পাণ্ডুরোগে মহিষীর মূত্র সহ মর্দ্দন করিয়া ইহা পুটপাক করিবে। বিড়ঙ্গ

ও চালুনি জল সহ পুটপাকে ক্রিমিরোগ নষ্ট হয়। ভল্লাতক ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ সহ যোগে কুষ্ঠরোগ, প্লীহায় রোহীতক ছালের ক্বাথ, মূত্রাঘাতে সিন্ধু বারের রস সহ, শূলে কাঁজি, দদ্রু, পামারোগে দদ্রুমারির রস সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। মুসলী রসের সহিত পুটপাক করিলে অর্শ, অর্জ্জুন ছালের ক্বাথ সহ পুটপাকে হৃদ্রোগ,উচ্চটারসে আমবাত,সোমরাজী ও খদির কাষ্ঠের ক্বাথ সহ কুষ্ঠে, পাষাণভেদীর রস যোগে অশ্মরী, ত্রিবৃৎ রসে উদাবর্ত্ত, টকদাড়িম রস সহ গুল্মে, স্বরভঙ্গে ব্রাহ্মীরস এবং অশ্বগন্ধা ও জটামাংসীর রস সহযোগে লৌহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ভস্মার্থে পুট প্রদান করিবে।

লৌহভস্মের অনুপান।

শূলে—হিং ও মধুর সহিত লৌহ ভস্ম সেবন করিতে হয়।
পুরাতন জ্বর-যথা ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে :—পিপ্পলি চূর্ণ সহ সেব্য।
বায়ু বৃদ্ধি জনিত বাত ও অর্দ্ধাঙ্গে :— ঘৃত ও রসুনের রস সহ।
শ্বাসেকাসে—মধু ও ত্রিকটুচূর্ণ সহ সেব্য।
শীতে—বৃশ্চিকালী ও মরিচ চূর্ণ সহ।
মেহে—ত্রিফলা ও মিছরীচূর্ণ সংযোগে।
ত্রিদোষ বৃদ্ধি জনিত যাবতীয় ব্যাধিতে—মধু ও আদার রস সহ।
বায়ু বৃদ্ধিতে—মাখন সহ।
পিত্ত বৃদ্ধিতে—কেবল মাত্র মধু সহ সেব্য।
কফ পিত্ত বৃদ্ধি জনিত রোগে—আদার রস সেব্য।
বায়ু বৃদ্ধি জনিত গাত্র কম্পনে—নিশুণ্ডীর রস সহ।
বায়ু বৃদ্ধিতে—শুণ্ঠীচূর্ণ সহ।
পিত্ত বৃদ্ধিতে—মিছরী চূর্ণ সহ।
কফ বৃদ্ধিতে—পিপুল চূর্ণ সহ।

সন্ধি রোগে—ত্রিজাতক সহযোগে সেব্য।

জরাব্যাধিতে—ত্রিফলা সহ।

শ্লেষ্ম রোগে—কজ্জলী, মধু ও পিপুল চূর্ণ সহ।

রক্তপিত্তে—চতুর্জাত মিশ্রিত গুড় সহ।

বলবৃদ্ধি করণে—গোদুগ্ধ ও পুনর্ণবা রস সংযোগে।

রক্তাল্পতায়—পুনর্ণবা রস সহ।

বিংশতি প্রকারের প্রমেহরোগে ও গণোরিয়ায়—মধু মিশ্রিত হরিদ্রা রস ও পিপুল চূর্ণ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে—শিলাজতু সহ।

কফরোগে—বাসক, পিপুল, দ্রাক্ষা, এবং মধূ একত্র মাড়িয়া সেব্য।

অগ্নিদীপ্তি করণে, ও দেহ কান্তিজননে—গামের রসের সহিত।

সর্ব্বরোগ নিবারণে—ত্রিফলা ও মধু সহ।

লৌহ ভস্মের মাত্রা।

লৌহ ভস্মের মাত্রা দুই রতি।

লৌহ সেবনে পথ্য

লৌহ সেবীর পক্ষে নিম্নলিখিত পথ্য ব্যবস্থেয় ঃ—

লাব, তিত্তির, গোধা, ময়ুর, শশক, বটক, কলবিঙ্ক, চটক, বর্ত্তক, বর্ত্তি, হরিতাল, বাজপক্ষী, বৃদ্ধলাব, সকল প্রকার মৃগ, টাট্‌কা মদ্‌গুর মৎস্য, রোহিত, ও শকুল মৎস্য, পাপিতাফল, পটোল, ডিণ্ডিসি, তাল আটির শস্য, শতাবরী, বেত্রাগ্র, তাড়ক, (তাল বৃক্ষের মাথি) তণ্ডুলীয়ক, বাস্তু, ধনেশাক, খর্ণালু, পুনর্ণবা, নারিকেল, খর্জ্জুর, দাড়িম, লবলীফল, শৃঙ্গাটক, পক্ক ও সুমিষ্ট আম্রফল, আঙ্গুর, জাতীফল, লবঙ্গ, সুপারি এবং পান প্রভৃতি পথ্য।

লৌহ সেবীর অপথ্য

লকুচ, কোল, কর্কন্ধু, বদর, লেবু, বীজপুর, করমর্দ্দক, তিন্তিড়ি, আনূপ মাংস, কর্করপক্ষী, পুণ্ডক, হংস, সারস, মদ্‌গু, কাক, বলাহক, মাষ, কন্দ, করীর, চনক, কদম্ব, কুষ্মাণ্ড, কর্কোটি, কেবুক, কলা, কালশাক, কশেরু, সর্ব্বপ্রকার দাইল, তিলতৈল, রসোন, রাজি, মদ্য, অম্লদ্রব্য, নষ্ট মৎস্য, জীরা, বার্ত্তাকু, মাষকলাই, কারবেল্ল, সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম, সর্ব্বপ্রকার সন্ধানদ্রব্য (যথা আসব অরিষ্ট প্রভৃতি), দীর্ঘকাল অশ্বারোহণ, শ্রম, অত্যধিক বাক্য কথন, স্নান, পান, আহার, শীত ও বায়ুসেবা, অসময়ে ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, বাতপিত্তকর দ্রব্য ভোজন, কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায়রস ভোজন, মৈথুন, ক্রোধ, শারীরিক পরিশ্রম এবং সকলপ্রকার ধাতু ও রসমারক দ্রব্যসকল অপথ্য।

অনিয়মিত লৌহ সেবনের দোষ নিবারণ উপায়

লৌহভস্ম বা অন্য ধাতু ভস্ম অনিয়মিত ভাবে সেবন করিলে যে দোষ সমুত্থিত হয়, তাহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত 'সিদ্ধিসার' সেবন ব্যবস্থেয়।

সিদ্ধিসার

হরীতকী চূর্ণ, সৈন্ধব, শুণ্ঠী, সাদাজীরা, সমপরিমাণে লইয়া তাহার প্রত্যেকটির দ্বিগুণ পরিমিত ত্রিবৃত গ্রহণ করতঃ লেবুর রসে ভাবনা দিতে হইবে।

মাত্রা—১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ রতি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে হয়। ইহা সেবনে যথাসময়ে মলপ্রবৃত্তি ও উদরের লঘুতা আনয়ন করে,

উদ্গারের বিশুদ্ধি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের অনবসাদ এবং মনের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করে।

অবিশুদ্ধ লৌহ সেবনে দোষ

লৌহ মারণে শাস্ত্রোল্লিখিত যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ আছে, তদপেক্ষা কম মাত্রায় ব্যবহার করিলে কিংবা অল্পসংখ্যক পুট দিলে কিংবা অল্পমাত্রায় গন্ধক ও পারদের সহিত মর্দ্দন করিলে লৌহ দোষযুক্ত হয়। এই দোষযুক্ত লৌহ সেবন করিলে মানুষ অল্পায়ু হয়।

অশুদ্ধ লৌহ সেবনজনিত বিকারের শান্তি ঃ—

অশুদ্ধ লৌহ সেবনজনিত দোষে, বাসকের রসে বিড়ঙ্গ মর্দ্দন করিয়া তাহাতে অধিক পরিমাণে বাসকরস মিশ্রিত করিয়া অধিককাল রৌদ্র-ভাবিত করিয়া সেবন করিতে হয়।

লৌহ দ্রাবণ

সাতদিন যাবৎ গন্ধককে দেবদালী রসে ভাবনা দিতে হইবে। তৎপরে উক্ত গন্ধক শুষ্ক করিয়া অগ্নি সংযোগে দ্রাবণ করতঃ লৌহে নিক্ষেপ করিলে তাহা পারদের ন্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দ্রাবিত হয়।

স্বর্ণ দ্রাবণ

ভেকের অস্থি এবং বসা, সোহাগা, করবীমূল, ঘোড়ার লালা, ও ইন্দ্রগোপকীট ইহাদের সহিত স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে কিছুক্ষণের জন্য ইহা দ্রাবিত হইয়া থাকে।

গন্ধক দ্রাবণ

গন্ধক এবং সোরা দগ্ধ করিয়া উভয়ের ধূমকে জলীয় বাষ্পের সহিত কোন সীসক পাত্রে একত্র মিশ্রিত করিলে গন্ধক দ্রাবক উৎপন্ন হয়। ইহা অগ্নির ন্যায় তেজঃশালী ও অতিশয় অগ্নিসন্দীপক।

মণ্ডূর (লৌহকিট্ট)

প্রদীপ্ত অঙ্গারাগ্নিতে লৌহকে উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ীর দ্বারা আঘাত করিলে চতুর্দ্দিকে যে মল নিক্ষিপ্ত হয় তাহায়ক মণ্ডূর কহে। মণ্ডূর লৌহ সদৃশ গুণশালী। অতএব রোগশান্তির জন্য মণ্ডূরও সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। লৌহকিট্ট অপেক্ষা মুণ্ড লৌহ দশগুণ উৎকৃষ্ট। মুণ্ড অপেক্ষা তীক্ষ্ণ শতগুণ উৎকৃষ্ট, তীক্ষ্ণ লৌহ অপেক্ষা কান্ত লৌহ সেবনে লৌহ লক্ষগুণ অধিক উপকার পাওয়া যায়। অতএব জরা মৃত্যু-নাশক কান্ত লৌহই সর্ব্বদা সেবন করা উচিত। কান্ত লৌহ অভাবে তৎস্থলে স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যবহার্য্য।

মণ্ডূরের প্রকার ভেদ ঃ—

মুণ্ড লৌহ হইতে উৎপন্ন মণ্ডূর ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট গুরু এবং কোমল; তীক্ষ্ণ লৌহ হইতে উৎপন্ন মণ্ডুর কজ্জল সদৃশ মসৃণ ও গুরু, কান্ত লৌহ হইতে প্রাপ্ত মণ্ডূর ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট, কর্কশ এবং অন্যান্য মণ্ডূর অপেক্ষা অধিকতর গুরু। ইহাকে দ্বিখণ্ড করিলে রৌপ্যের ন্যায় স্তর বিশিষ্ট দেখা যায়।

ঔষধে ব্যবহার্য্য মণ্ডূর।

(১) ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য মণ্ডূর কোটর বিহীন—গুরু, স্নিগ্ধ, দৃঢ়, শতবর্ষের পুরাতন ও বহু প্রাচীন গ্রাম হইতে সংগৃহীত হওয়া উচিত।

(২) শতবর্ষের অধিক পুরাতন মণ্ডুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অশীতিবর্ষের অধিক মণ্ডুর মধ্যগুণবিশিষ্ট ৬০ বৎসরের মণ্ডূর অধম। ৬০ বৎসর হইতে কম পুরাতন মণ্ডূর বিষবৎ; তাহা ঔষধার্থে কদাচ ব্যবহার করা উচিত নয়।

উদ্গারের বিশুদ্ধি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের অনবসাদ এবং মনের স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করে।

অবিশুদ্ধ লৌহ সেবনে দোষ

লৌহ মারণে শাস্ত্রোল্লিখিত যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ আছে, তদপেক্ষা কম মাত্রায় ব্যবহার করিলে কিংবা অল্পসংখ্যক পুট দিলে কিংবা অল্পমাত্রায় গন্ধক ও পারদের সহিত মর্দ্দন করিলে লৌহ দোষযুক্ত হয়। এই দোষযুক্ত লৌহ সেবন করিলে মানুষ অল্পায়ু হয়।

অশুদ্ধ লৌহ সেবনজনিত বিকারের শান্তি ঃ—

অশুদ্ধ লৌহ সেবনজনিত দোষে, বাসকের রসে বিড়ঙ্গ মর্দ্দন করিয়া তাহাতে অধিক পরিমাণে বাসকরস মিশ্রিত করিয়া অধিককাল রৌদ্র-ভাবিত করিয়া সেবন করিতে হয়।

লৌহ দ্রাবণ

সাতদিন যাবৎ গন্ধককে দেবদালী রসে ভাবনা দিতে হইবে। তৎপরে উক্ত গন্ধক শুষ্ক করিয়া অগ্নি সংযোগে দ্রাবণ করতঃ লৌহে নিক্ষেপ করিলে তাহা পারদের ন্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দ্রাবিত হয়।

স্বর্ণ দ্রাবণ

ভেকের অস্থি এবং বসা, সোহাগা, করবীমূল, ঘোড়ার লালা, ও ইন্দ্রগোপকীট ইহাদের সহিত স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে কিছুক্ষণের জন্য ইহা দ্রাবিত হইয়া থাকে।

গন্ধক দ্রাবণ

গন্ধক এবং সোরা দগ্ধ করিয়া উভয়ের ধূমকে জলীয় বাষ্পের সহিত কোন সীসক পাত্রে একত্র মিশ্রিত করিলে গন্ধক দ্রাবক উৎপন্ন হয়। ইহা অগ্নির ন্যায় তেজঃশালী ও অতিশয় অগ্নিসন্দীপক।

মণ্ডূর (লৌহকিট্ট)

প্রদীপ্ত অঙ্গারাগ্নিতে লৌহকে উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ীর দ্বারা আঘাত করিলে চতুর্দ্দিকে যে মল নিক্ষিপ্ত হয় তাহায়ক মণ্ডূর কহে। মণ্ডূর লৌহ সদৃশ গুণশালী। অতএব রোগশান্তির জন্য মণ্ডূরও সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। লৌহকিট্ট অপেক্ষা মুণ্ড লৌহ দশগুণ উৎকৃষ্ট। মুণ্ড অপেক্ষা তীক্ষ্ণ শতগুণ উৎকৃষ্ট, তীক্ষ্ণ লৌহ অপেক্ষা কান্ত লৌহ সেবনে লৌহ লক্ষগুণ অধিক উপকার পাওয়া যায়। অতএব জরা মৃত্যু-নাশক কান্ত লৌহই সর্ব্বদা সেবন করা উচিত। কান্ত লৌহ অভাবে তৎস্থলে স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যবহার্য্য।

মণ্ডূরের প্রকার ভেদঃ—

মুণ্ড লৌহ হইতে উৎপন্ন মণ্ডূর ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট গুরু এবং কোমল; তীক্ষ্ণ লৌহ হইতে উৎপন্ন মণ্ডুর কজ্জল সদৃশ মসৃণ ও গুরু, কান্ত লৌহ হইতে প্রাপ্ত মণ্ডূর ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট, কর্কশ এবং অন্যান্য মণ্ডূর অপেক্ষা অধিকতর গুরু। ইহাকে দ্বিখণ্ড করিলে রৌপ্যের ন্যায় স্তর বিশিষ্ট দেখা যায়।

ঔষধে ব্যবহার্য্য মণ্ডূর।

(১) ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য মণ্ডূর কোটর বিহীন—গুরু, স্নিগ্ধ, দৃঢ়, শতবর্ষের পুরাতন ও বহু প্রাচীন গ্রাম হইতে সংগৃহীত হওয়া উচিত।

(২) শতবর্ষের অধিক পুরাতন মণ্ডুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অশীতিবর্ষের অধিক মণ্ডুর মধ্যগুণবিশিষ্ট ৬০ বৎসরের মণ্ডূর অধম। ৬০ বৎসর হইতে কম পুরাতন মণ্ডূর বিষবৎ; তাহা ঔষধার্থে কদাচ ব্যবহার করা উচিত নয়।

মণ্ডূরের শোধন ও মারণ বিধি।

১। মণ্ডূর বহেড়া কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, বহেড়া কাষ্ঠের পাত্রস্থিত গোমূত্রে যথাক্রমে সাতবার নির্ব্বাপিত করিবে। তৎপরে সেই মণ্ডূরের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সর্ব্বকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। অথবা গোমূত্রের সহিত ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই কাথে উত্তপ্ত মণ্ডূর বারংবার নির্ব্বাপিত করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মণ্ডূর জীর্ণ হইয়া না যায়, ততক্ষণ ঐরূপ উত্তপ্ত করিয়া নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। তৎপরে সেই মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে।

অথবা মণ্ডূর অতি সূক্ষ্ম করিয়া গুঁড়া করিয়া আটগুণ গোমূত্রের সহিত সিদ্ধ করিবে। যথেষ্টরূপে সিদ্ধ হইলে পুনরায় গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিবে।

মণ্ডূরের ব্যবহার।

মণ্ডূর ভস্ম নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত হইয়া প্রত্যহ এক তোলা পরিমিত (ঐ মিশ্র) সেবিত হইলে পাণ্ডু, শোথ, হলীমক, উরুস্তম্ভ, কামলা ও অর্শ আরোগ্য হয়:—ত্রিকটু, ত্রিফলা মুতা, বিড়ঙ্গ, চব্য চিত্রক, দার্ব্বীগ্রন্থী এবং দেবদারু। এই প্রকারে ব্যবহৃত মণ্ডুরকে হংস মণ্ডুর কহে। এই ঔষধ হজম হইলে তক্র পান করা উচিত।

মণ্ডূরের দ্রাবন।

বিড়ঙ্গকে বকফুলের পাতার রসে মাড়িয়া বহুদিন যাবৎ ঐ রসে ভাবনা দিবে। লৌহ কিট্টকে ঐ রসে অল্পক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে দ্রাবিত হয়।

যশোদ (দস্তা)।

যশোদ রসকের সার। ইহা বৈদ্যগণের যশ প্রদাতা। জ্ঞানী বৈদ্যগণ ইহার ব্যবহারে সফল মনোরথ হইয়া প্রকৃতই যথেষ্ট যশ অর্জ্জনে সমর্থ হন।

ইহার গুন।

যশোদ কষায়, তিক্ত, শীতল, চক্ষুর হিতকর, কফ, পিত্ত, প্রমেহ পাণ্ডু, ও শ্বাস রোগ নাশক।

যশোদ শোধন বিধি।

(১) ইহাকে অগ্নিতে গলাইয়া চূণের জলে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

(২) অথবা গলাইয়া কলার এঁটের রসে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হয়।

যশোদ ভস্ম বিধি।

যশোদ মারণের বিশিষ্ট বিধি স্বর্ণ ভস্মের ন্যায় ৪র্থ বিধি দ্রষ্টব্য।

যশোদ ভস্ম সেবন বিধি।

অতিসারে—কাঁটানটের মূল ও খেজুর একত্র জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ জলের সহিত সেব্য।

শীতজ্বরে—যোয়ান ও লবঙ্গ চূর্ণের সহিত।

বমিতে—চিনি ও জীরা চূর্ণের সহিত।

চক্ষুরোগে—পুরাতন ঘৃতের সহিত অঞ্জন গ্রহণ কর্ত্তব্য।

প্রমেহ রোগে—পানের রসের সহিত।

অগ্নিমান্দে—অগ্নিমন্থের (পাথরকুচি) রসের সহিত।

ত্রিদোষে—ত্রিসুগন্ধির সহিত।

যশোদের মাত্রা।

হরিতাল সংযোগে জারিত যশোদ এক রতি মাত্রায় প্রত্যহ সেব্য। হরিতাল ভিন্ন জারিত যশোদ ২ রতি মাত্রায় সেব্য।

অশুদ্ধ যশোদ সেবনের দোষ।

অশোধিত যশোদ এবং যাহা বিধি পূর্ব্বক ভস্মীভূত নহে এরূপ যশোদ সেবনে প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য, বমি প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

অশুদ্ধ যশোদ সেবন জনিত দোষের শান্তি

তিনদিন বালা ও হরীতকী চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশুদ্ধ যশোদ সেবন জনিত দোষের শান্তি হয়।

বঙ্গ (টিন)।

দুই প্রকারের বঙ্গ আছে যথা—খুবক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে খুবক বঙ্গই উৎকৃষ্ট। খুবক বঙ্গ শ্বেতবর্ণ, মৃদু, স্নিগ্ধ, শীঘ্র দ্রবীভূত হয়, গুরুত্ব বিশিষ্ট এবং অগ্নিতাপে ইহাতে কোনরূপ শব্দ নির্গত হয় না। মিশ্রক বঙ্গ শ্যাম মিশ্র শুভ্রবর্ণ, উভয় বঙ্গই তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ঈষৎ বায়ু প্রকোপক এবং মেহ, শ্লেষ্মরোগ, মেদ ও ক্রিমি নিবারক।

বঙ্গের গুণ।

যথাবিধি ভস্মীকৃত বঙ্গ বল, অগ্নি, ক্ষুধা, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধকর। ইহা নিয়মিত সেবনে ক্ষয়, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি নিবারণ করে। ইহা ধাতুস্থৈর্য্যকারক ও প্রমেহ নাশক!

বঙ্গের শোধন বিধি।

(১) বঙ্গ দ্রবীভূত করিয়া হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিবে। তিনবার এইরূপ করিলে খুবক বঙ্গ নিশ্চিতই শোধিত হয়।

(২) পুনর্ণবা, কুঁচিলা ও কটু অলাবুর (তিতলাউ) সহিত মর্দ্দন করিয়া অম্ল তক্রে নিক্ষেপ করিলেও বঙ্গ বিশুদ্ধ হয়।

(৩) বঙ্গ ও সীসককে সাতবার ঘোষাচূর্ণ ও আকন্দের আঠা লেপন করিয়া আতপে শুষ্ক করিলেও বঙ্গও সীসক বিশুদ্ধ হয়। নিসিন্দা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিলেও বঙ্গ শোধিত হইয়া থাকে।

বঙ্গ ভস্ম।

(১) বঙ্গের পাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হরিতাল ও আকন্দের আটা লেপন করিবে। তৎপরে সেই বঙ্গ অশ্বত্থ ও তেঁতুল গাছের শুষ্ক ছালের (চটায়) ক্ষারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুট পাক করিবে। পাক শেষে সেই ভস্ম চূর্ণ করিয়া লইবে এবং রসাদি ক্রিয়ায় তাহা প্রয়োগ করিবে।

(২) একটী মৃৎপাত্রে বঙ্গ গলাইয়া তাহাতে তাহার ষোড়শাংশ পারিমিত পারদ নিক্ষেপ করিবে, এবং, অল্প অল্প হরিতাল চূর্ণ বারংবার নিক্ষেপ করিয়া ভারদ্বাজের (বন কাপাসের) কাষ্ঠ দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। এইরূপে ভস্ম প্রস্তুত করিয়া তাহা রস ক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে।

(৩) স্বর্ণ ভস্মের ন্যায় বঙ্গ ভস্ম করিলে সেই ভস্ম বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হয়।

(৪) পলাশ রসে হরিতাল মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা বঙ্গের পাত লেপন করিয়া পুট পাক করিলে বঙ্গ সহজে ভস্ম হয়।

বঙ্গভস্ম সেবন বিধি।

আট রতি পরিমাণে (উপযুক্ত মাত্রায়) এই বঙ্গ ভস্ম গব্যতক্রপিষ্ট হরিদ্রার সহিত লেহন করিলে, ইহাদ্বারা সুন্দর রূপে রসায়ন ক্রিয়া নিষ্পন্ন

হয় এবং বিংশতি প্রকার মেহ রোগ নিশ্চিত বিনষ্ট হয়। বঙ্গ ভস্ম সেবন করিয়া শালি ধান্যের অন্ন, মুগের যূষ, নবনীত, তিল তৈল, পটোল, তিক্ত তেলকুচা ও ঘোল এই সকল পথ্য প্রশস্ত।

বঙ্গের অনুপান।

মুখের দুর্গন্ধে—কর্পূরের সহিত বঙ্গ সেব্য।

জাতী ফলের সহিত সেবনে ইহা দেহ পুষ্ট করে ও বীর্য্য ধারণ শক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রমেহ রোগে—তুলসী পাতার রস।

রক্ত শূন্যতায়—ঘৃত সহ।

গুল্ম রোগে—সোহাগা সহ (শোধিত)।

অম্লপিত্ত রোগে—হরিদ্রা সহ।

মধু সহ সেবনে মল বৃদ্ধি হয়।

পিত্ত বৃদ্ধিতে—মিশ্রী সহ।

পানের রসের সহিত সেবনে শুক্র বৃদ্ধি হয়।

জীর্ণশক্তি লোপে—পিপুল চূর্ণ সহ।

হাঁপ ও শ্বাসে—হরিদ্রাসহ সেব্য।

চাঁপাফুলের রসের সহিত সেবন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

বায়ুবৃদ্ধি জনিত পীড়ায়—মৃগনাভি সহ।

চর্ম্ম রোগে—খদির কাথের সহিত।

অজীর্ণে—সুপারি সহ।

ক্ষয় রোগে—নবনীত সহিত।

দুগ্ধ সহ সেবনে ইহা খুব পুষ্টিকারক।

ভাঙ্ (সিদ্ধি) সহ সেবনে বীর্য্য স্তম্ভন হয়।

বায়ু জনিত পীড়ায়—রসুনের রস সহ সেব্য।

কুষ্ঠ ব্যাধিতে—সমুদ্র ফল ও নির্গুণ্ডী রস সহ।

ক্লৈব্যে—অপমার্গের মূল সহ বঙ্গ সেবন সুন্দর ফলপ্রদ।

জননেন্দ্রিয়ের শক্তি বর্দ্ধনে লবঙ্গ, সমুদ্রফল ও পানের রসের সহিত বঙ্গ মলম আকারে ব্যবহার্য্য।

ইহার তিলক কপালে ধারণ করিলে সম্মোহন শক্তি লাভ হয়।

এরণ্ড মূলের রস ও জল সহ কপালে লেপন করিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

সীসক।

সীসক শীঘ্র দ্রবীভূত হয়। ইহা অত্যন্ত ভার বিশিষ্ট, ছেদন করিলে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়। পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এবং বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ সীসক প্রশস্ত নহে। তদতিরিক্ত সীসকই নির্দ্দোষ। সীসক অতিশয় উষ্ণবীর্য্য স্নিগ্ধ, তিক্তরস, বাতশ্লেষ্মনাশক প্রমেহ ও জলদোষ নিবারক, অগ্নির উদ্দীপক এবং আমবাত নাশক!

সীসক অগ্নিজ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে নিসিন্দামূল, বারাহীকন্দ ও ও হরিদ্রার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। দ্রবীভূত হইলে সেই সীসক নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিবে। তিন বার এইরূপ করিলে সীসক শুদ্ধ হয় এবং সেই শোধিত সীসক সেবন করিলে, মূর্চ্ছা ও স্ফোটকাদি পীড়া উৎপন্ন হয় না।

সীসকের গুণ।

ভস্মীভূত সীসক জীবনীশক্তি ও শুক্র বর্দ্ধক; ইহা হজম শক্তি বর্দ্ধন করে। দীর্ঘকাল নিয়মিত ব্যবহারে প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি করে।

সীসক মিষ্ট এবং তিক্ত রসযুক্ত। ইহা রৌপের রঞ্জক। দীর্ঘকাল ব্যবহারে জীবনীশক্তি বীর্য্য ও স্মরণ শক্তি বর্দ্ধন করে।

যথারীতি ভস্মীকৃত সীসক ক্ষয়, বায়ুজনিত পীড়া, গুল্ম, রক্তাল্পতা ক্রিমি, শূল, অতিসার ইত্যাদি অনেক ব্যাধি নষ্ট করে।

শুদ্ধ সীসকের পরীক্ষা।

যে সীসক শীঘ্র গলিয়া যায়, অতি ভার বিশিষ্ট, এবং যাহা ছেদন করিলে সমুজ্জল কৃষ্ণবর্ণ দেখায় তাহা বিশুদ্ধ।

সীসক শোধন বিধি।

সীসককে পাত করিয়া, নির্গুণ্ডী (নিসিন্দা) মূল চূর্ণ আকন্দের আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ পাতে লাগাইয়া শুষ্ক করিতে হইবে, তারপর গলাইয়া নিসিন্দার রসে নিমগ্ন করিবে এই ক্রিয়া সাতবার করিলে সীসক শোধিত হয়। সীসককে দ্রবীভূত করিয়া কলার এঁটের রসে সিক্ত করিলে উহা শোধিত হয়।

সীসকের ভস্ম বিধি।

১। সীসক ভস্মের বিধি স্বর্ণ ভস্মের ন্যায়। (চতুর্থ বিধি দ্রষ্টব্য)।

২। সমপরিমিত সীসক ও যবক্ষার একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রবল অগ্নিতাপে চড়াইবে ও লৌহদর্ব্বি দ্বারা নাড়িবে এবং ধুলিবৎ চূর্ণীকৃত হইলে নামাইয়া বটের ঝুড়ির ক্বাথে মাড়িয়া পুটপাক করিবে।

৩। সীসক পত্রে মনঃশিলা ও আকন্দের আটা লেপন করিয়া পুটপাক করিলে তাহার নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সীসকের অমৃতী করন।

দুই পল সীসক ভস্ম সমপরিমিত হিঙ্গুল ও একতোলা গন্ধক একত্র নিম্বুরসে (লেবুররসে) মর্দ্দন করিয়া গজ পুটেপাক করিবে। এই প্রকারে সীসক অশেষ শক্তিশালী হয়।

সীসকের অনুপান।

সীসক ভস্ম চিনি সহ সেবন করিলে বায়ু, পিত্ত, শিরঃশূল, চক্ষুর পীড়া শুক্রদোষ, প্রলাপ, প্রদাহ অগ্নিমান্দ্য নিরাময় হয়।

অশোধিত সীসক সেবন জনিত দোষের শান্তি।

হরীতকী ও চিনিসহ স্বর্ণ ভস্ম তিনদিন সেবন করিলে উক্তদোষের শান্তি হয়।

মিশ্র ধাতু।

পিতল।

পিতল দুই প্রকার—রীতিকা ও কাকতুণ্ডী। যে পিতল উত্তপ্ত করিয়া কাঁজিতে নিক্ষেপ করিলে, তাম্র বর্ণ হয় তাহা রীতিকা। আর যাহা উত্তপ্ত করিয়া কাঁজিতে নিক্ষেপ করিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় তাহা কাক তুণ্ডী।

পিতলের গুন।

রীতিকা পিতল তিক্তরস, রুক্ষ, ক্রিমিনাশক, রক্ত-পিত্ত-নিবারক, কুষ্ঠ নাশক, সংযোগবশে ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য কিন্তু স্বভাবতঃ শীতবীর্য্য। কাক তুণ্ডী পিতল—রুক্ষ, তিক্তরস, উষ্ণ,কফপিত্ত নাশক, যকৃৎ-পীহা নিবারকও শীতবীর্য্য।

পিতল শোধন বিধি।

পিতল উত্তপ্ত করিয়া, হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দার রসে পাঁচবার নিক্ষেপ করিলে বিশোধিত হয়।

পিতল ভস্ম বিধি।

(১) পিতল ভস্মের বিধি তাম্রের ন্যায়।

(২) লেবুররস, মনঃশিলা ও গন্ধকের সহিত পিত্তল মর্দ্দন করিয়া আটবার পুটপাক করিলে পিতল ভস্মরূপে পরিণত হয়।

পিতলের ব্যবহার।

পিতল ভস্ম, কান্ত লৌহভস্ম ও অভ্র সত্ব এই তিন দ্রব্যসম পরিমাণে লইয়া সমষ্টির সমপরিমিত ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, বামনহাটীর বীজ, বনযমানী, চিতামূল, ভেলা ও তিল চূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা পরিমাণে সেবন করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিশেষতঃ শ্বেতকুষ্ঠ নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক।

কাংস্য।

আটভাগ তাম্র ও দুইভাগ রঙ্গ (দস্তা) দ্রবীভূত করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে কাংস্য প্রস্তুত হয়। সৌরাষ্ট্র দেশজাত কাংস্য শুভ ফলপ্রদ। অথবা তীক্ষ্ণশব্দকারী, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঈষৎ শ্যামযুক্তশুভ্রবর্ণ, নির্ম্মল ও দগ্ধ করিলে যাহা রক্তবর্ণ হয়, এই ষড়বিধ গুণযুক্ত কাংস্যই প্রশস্ত। যে কাংস্য পীতবর্ণ, দগ্ধ করিলে তাম্রবর্ণ হয় এবং যাহা খরস্পর্শ, রুক্ষ, ঘন, আঘাত সহনে অসমর্থ ও মর্দ্দন করিলে যাহার জ্যোতিঃ নির্গত হয়, এই সপ্তবিধ কাংস্য পরিত্যাগ করিবে।

কাংস্যের গুণ।

কাংস্য লঘু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, দৃষ্টির প্রসন্নতা সাধক, ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক, অগ্নির উদ্দীপক এবং হিতকর। একমাত্র ঘৃত ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল দ্রব্যই কাংস্য পাত্রে সেবন করিলে আরোগ্য, সুখ ও সাস্থ্য লাভ হয়।

কাংস্যের শোধন বিধি।

কাংস্য উত্তপ্ত করিয়া গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিলে শোধিত হয়।

অথবা তিনঘণ্টাকাল প্রখর অগ্নিতে গোমূত্রে সিদ্ধ করিলে শোধিত হয়।

কাংস্যের ভস্ম বিধি।

শোধিত কাংস্য গন্ধক ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া পাঁচবার পুটপাক করিলে উহার নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তলৌহ।

কাংস্য, তাম্র, পিতল, লৌহ ও সীসক এই পঞ্চধাতুর সংমিশ্রণে বর্ত্তলৌহের উৎপত্তি হয়। ইহার অপর নাম পঞ্চলৌহ।

বর্ত্তলৌহের গুণ।

বর্ত্তলৌহ শীতবীর্য্য, অম্লকটু-রস, রুক্ষ, কফপিত্তনাশক, রুচিকর, ত্বকের হিতকর, ক্রিমিনাশক, নেত্রের উপকারক এবং মলশুদ্ধি কারক। বর্ত্তলৌহের পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন ও সূপাদি পাক করিলে এবং তাহাতে অম্লপদার্থের সংযোগে না থাকিলে সেই সকল পদার্থ অগ্নিবৃদ্ধিকর ও পাচক হইয়া থাকে।

বর্ত্তলোহের শোধন বিধি।

বর্ত্তলৌহ দ্রবীভূত করিয়া অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়।

বর্ত্তলৌহ ভস্ম বিধি।

উক্তরূপে শোধিত বর্ত্তলোহ গন্ধক ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

ত্রিলৌহ।

পঁচিশ ভাগস্বর্ণ, ষোল ভাগ রৌপ্য ও দশ ভাগ তাম্র একত্র গলাইয়া ত্রিলৌহ প্রস্তুত হয়। ইহা সর্ব্বদোষ নষ্ট করে এবং শ্রেষ্ঠ রসায়ন। ইহা অগ্নি বর্দ্ধক ও সর্ব্বরোগ নাশক।

ত্রিলৌহের শোধন ও ভস্ম বিধি।

ইহা স্বর্ণেরশোধন ও ভস্ম বিধি অনুসারে শোধিত ও ভস্মীভূত হয়। সম্যক্‌রূপে শোধিত ও ভস্মীভূত না হইলে ইহা বিষবৎ ক্রিয়া করে।

ত্রিলৌহ রসায়ন।

যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতে ১ রতি করিয়া ত্রিলৌহ ভস্ম মধু, ঘৃত, ত্রিফলা ও ত্রিকটু সংযোগে সেবন করে সে সুখী, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান হয়।

রত্ন।

মণি সমূহও পারদের বন্ধন কারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বৈক্রান্ত, সূর্য্যকান্ত, হীরক, মুক্তা, চন্দ্রকান্ত, রাজাবর্ত্ত, গরুরোদগীর্ণ, (মরকত), পুষ্পরাগ, মহানীল, পদ্মরাগ (মাণিক্য) প্রবাল, বৈদূর্য্য ও নীল, এইগুলি মণিনামে পরিচিত।

পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, মরকত, পুষ্পরাগ ও হীরক, এই পাঁচটী শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মাণিক্য, মুক্তা, প্রবাল, মরকত, পুষ্পরাগ, হীরক, নীলমণি, গোমেদ ও বৈদূর্য্য, এই নয়টী মনি যথাক্রমে নবগ্রহের প্রীতিপ্রদ। পদ্মরাগ (মাণিক্য), পুষ্পরাগ, প্রবাল, মুক্তা, মরকত, হীরক, নীলমণি, গোমেদ ও বৈদূর্য্য এই সকল মণি যথাক্রমে ইষ্ট সিদ্ধির জন্য মুদ্রা ধারণে প্রশস্ত।

এই সমস্ত রত্ন সুলক্ষণ ও সুজাত হইলেই তাহারা রসক্রিয়ার, রসায়ন কার্য্যে, দানে, ধারণে ও দেবপূজায় সিদ্ধিপ্রদ।

মাণিক্য।

মাণিক্য দুই প্রকার, পদ্মরাগ ও নীলগন্ধি। পদ্মদলের ন্যায় যাহার কান্তি এবং যাহা স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ ও অতিশয় উজ্জ্বল, তাহাই পদ্মরাগ। বৃত্ত, আয়ত, সম ও স্থূল পদ্মরাগ উৎকৃষ্ট। আর যাহা গঙ্গাম্বু হইতে উৎপন্ন

এবং নীলগর্ভ রক্তবর্ণ তাহাই নীলগন্ধি মাণিক্য। ইহাও পদ্মরাগের ন্যায় বৃত্তাদিগুণ বিশিষ্ট হইলেই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

রন্ধ্রযুক্ত, কর্কশ, মলিন, রুক্ষ, অস্বচ্ছ, চ্যাপ্‌টা, লঘু ও বক্র এই আট প্রকার মাণিক্য দূষিত।

মাণিক্য অগ্নির উদ্দীপক, বৃষ্য, কফ বাতনাশক, ক্ষয়রোগ নিবারক এবং ভূত, বেতাল, পাপ ও কর্ম্মজ ব্যাধি সমুহের শান্তিকারক।

মৌক্তিক।

আহ্লাদ জনক, শ্বেতবর্ণ, লঘু, স্নিগ্ধ, কিরণ বিশিষ্ট, নির্ম্মল, বৃহৎ, জল-বিম্ববৎ ও গোলাকার এই নয় প্রকার গুণযুক্ত মৌক্তিক শুভ জনক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মুক্তা লঘু, শীতল, মধুররস, কান্তিবর্দ্ধক, দৃষ্টিশক্তির উৎকর্ষজনক, অগ্নিদীপ্তিকর, পুষ্টিজনক, বিষনাশক, বিরেচক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। সমুদ্রে যে শুক্তিজন্মে; তাহা উজ্জ্বল এবং পরিণাম শূলের অচিরাৎ শান্তি কারক।

যে মুক্তা রুক্ষাঙ্গ, শুষ্কবৎ, শ্যাববর্ণ, তাম্রাভ ও লবণ সদৃশ, অর্দ্ধাংশে শুভ্র, বিকটাকার অথবা গ্রন্থিবিশিষ্ট, সেই সমস্ত মুক্তা পরিত্যাগ করিবে।

মুক্তা, কফপিত্ত ও ক্ষয়রোগ নাশক;কাস, শ্বাস ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক পুষ্টিজনক, শুক্র বর্দ্ধক, আয়ুঃবর্দ্ধক এবং দাহ শান্তি কারক।

মুক্তা নিম্নলিখিত বিষয় গুলি হইতে উৎপন্ন হয় ঃ— হস্তী, ভেক শূকর, শঙ্খ, মৎস্য, শুক্তি এবং বংশ।

গজমুক্তা।

হস্তী হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায় তাহাকে গজ মুক্তা বলে। ইহা খুব উজ্জ্বল, জয় প্রদানকারী এবং রোগসকলের শান্তিকারক।

সর্পমণি।

সর্পমণি রম্য, নীলবর্ণজ্যোতিবিশিষ্ট এবং অতিশয় উজ্জ্বল। ইহা তিন প্রকার। কাঁঠালের আকৃতি সদৃশ, আমলকী সদৃশ ও গুঞ্জাবীজ সদৃশ।

মীনমুক্তা।

ইহা, কুঁচবীজ সদৃশ। এক প্রকার তিমি জাতীয় মৎস্যের ভিতর উৎপন্ন হয়। ইহা লঘু এবং পারুল পুষ্প সদৃশবর্ণ বিশিষ্ট। ইহা গোলাকার এবং তত উজ্জ্বল নয়।

মীন মুক্তা মৎস্যাক্ষি সদৃশ পবিত্র এবং বহুগুণ বিশিষ্ট ও বৃহৎ। ইহা তিমি মুখে উৎপন্ন হয়।

বরাহ মুক্তা।

কোন কোন বরাহের দন্তমূলে যে মুক্তা উৎপন্ন হয় তাহাকে বরাহ মুক্তা বলে। ইহা চন্দ্রবিম্ব সদৃশ উজ্জ্বল এবং বহু গুণ সম্পন্ন!

বেণু মুক্তা।

বংশজাত মুক্তা (বংশের মধ্যে হয়) চন্দ্রবিম্ব সদৃশ উজ্জ্বল। হরিদ্রাভ বর্ণবিশিষ্ট। বংশলোচনের সহিত ইহার প্রভেদ—বংশলোচন চিনির ন্যায় দ্রব্য, কোমল ও লঘু ; বেণুমুক্তা কঠিন এবং গুরু।

শঙ্খ মুক্তা।

শঙ্খমুক্তা চন্দ্র সদৃশ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট। ইহা বর্ত্তুলাকার উজ্জ্বল এবং মনোহর। কুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং সময়ে সময়ে পারাবতের অণ্ড সদৃশ বৃহৎ হইয়া থাকে।

দর্দ্দুর মুক্তা।

ভেকের শিরে যে মুক্তা জন্মে তাহা সর্প-মনি সদৃশ।

শুক্তি মুক্তা।

শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহাকে শুক্তি মুক্তা কহে। শঙ্খ ও শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা অন্যান্য মুক্তা অপেক্ষা হীন। যে মুক্তা সমুদ্রে জন্মে (মীন মুক্তা, শঙ্খ মুক্তা, শুক্তি মুক্তা,) তাহা বীর্য্যবান এবং রোগ বিনাশকারী।

প্রবাল।

পক্ক বিম্ব ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, বৃত্ত ও দীর্ঘাকৃতি, অবক্র, স্নিগ্ধ, অক্ষত ও স্থূল এই সাতপ্রকার প্রবাল শুভ ফলপ্রদ।

পাণ্ডু বা ধূসরবর্ণ, সূক্ষ্ম,ক্ষতবিশিষ্ট, অভ্যন্তর কণ্ডরারার ন্যায় কোটর বা অর্ব্বুদ বিশিষ্ট, ভারশূন্য, তাম্রবর্ণ এই আট প্রকার প্রবাল প্রশস্ত নহে।

প্রবাল অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘু, ক্ষীণ, পিত্ত, রক্ত ও কাস নিবারক এবং নেত্ররোগের শান্তিকারক।

তার্ক্ষ্য

হরিদ্বর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, কিরণ বিশিষ্ট, মসৃণ, উজ্জ্বল ও স্থূল এই সপ্ত বর্ণ বিশিষ্ট মরকত মণি প্রশস্ত। যে মরকত কপিল নীল পাণ্ডু বা কৃষ্ণবর্ণ; কর্কশ, লঘু, চ্যাপটা, বিকট ও রুক্ষ, তাহা অপ্রশস্ত। মরকত মণি জ্বর, বমি, বিষদোষ, শ্বাস, সন্নিপাত, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, পাণ্ডু ও শোথ রোগের উপশমকারক এবং ওজোবৃদ্ধিকর।

পুষ্পরাগ।

গুরু, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, স্থূল, সমগাত্র, মৃদু, মসৃণ এবং কর্ণিকার কুসুমের ন্যায় পীতবর্ণ, এই অষ্টবিধ গুণযুক্ত পুষ্পরাগ মণি শুভজনক। পীত, শ্যাম, কপিশ, কপিল বা পাণ্ডুবর্ণ প্রভাহীন, কর্কশ, রুক্ষ ও অসমগাত্র পুষ্পরাগ মণি পরিত্যাগ করিবে। পুষ্পরাগ অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘুপাক এবং বিষদোষ, বমন, কফ, বায়ু, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, কুষ্ঠ ও রক্তদোষের উপশমকারক।

বজ্র।

পুং, স্ত্রী, ও নপুংসক ভেদে বজ্র (হীরক) তিন প্রকার। রসবীর্য্য ও বিপাকে ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ নপুংসক অপেক্ষা স্ত্রী এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুংজাতীয় হীরক শ্রেষ্ঠ।

অষ্ট কোন অষ্ট ফলক বা ষট্‌কোণযুক্ত অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট এবং মেঘ, ইন্দ্রধনু অথবা স্বচ্ছ জলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হীরককে পুংজাতীয় হীরক কহে। যাহা বর্ত্তুলাকার, দীর্ঘ ও চ্যাপ্‌টা, তাহা স্ত্রী-জাতীয়। আর যাহা বর্ত্তুলাকার কিন্তু কোণাগ্রে সঙ্কুচিত এবং কিঞ্চিৎ গুরু, তাহাই নপুংসক জাতীয় হীরক।

স্ত্রী পুরুষ ও নপুংসক ব্যক্তিকে যথাক্রমে স্ত্রীজাতীয়, পুংজাতীয়, ও নপুংসকজাতীয় হীরক প্রয়োগ করিবে। পুংজাতীয় হীরক ভিন্ন অপর কোন হীরক এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহা ফলপ্রদ হয় না। অর্থাৎ পুংজাতীয় হীরক স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক সকলের পক্ষেই উপকারী। এই ত্রিবিধ হীরক প্রত্যেকেই আবার শ্বেতাদি বর্ণ ভেদে চতুর্ব্বিধ। সেই চতুর্ব্বিধ বিভাগ বর্ণ ভেদানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হয়। শ্বেতবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ জাতীয়, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রজাতীয়। এই সকলের মধ্যে পীতবর্ণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর উত্তম জাতীয় হীরক অধিক ফলপ্রদ।

হীরকের শোধন।

(১) কুলথের ক্বাথ অথবা কোদধান্যের ক্বাথ সহ এক প্রহর পর্য্যন্ত স্বিন্ন করিলে হীরক শোধিত হয়।

(২) যে কোন প্রকার রত্ন দোলাযন্ত্রে জয়ন্তি পাতার রসে ৩ ঘণ্টা পাক করিলে শোধিত হয়।

হীরকের ভস্মবিধি।

শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট হীরক অশ্বথ, বদরী ও জয়ন্তি বৃক্ষের ছাল, মাক্ষিক ও কাঁকড়ার খোলা ও সমপরিমাণ মনসা বৃক্ষের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া ঐ মলম লাগাইয়া গজপুটে পাক করিলে হীরক ভস্মীভূত হয়।

লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট হীরক করবী, মেষশৃঙ্গী, বদরী ও উডুম্বরা সম পরিমিত আকন্দের আঠার সহিত মাড়িয়া মলম প্রস্তুত করিয়া ঐ মলম লাগাইয়া গজপুটে পাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

পীতবর্ণবিশিষ্ট হীরক বালা, অতিবালা, গন্ধক, ও কচ্ছপের চেটো সমপরিমিত ইন্দ্রবারুণীর (রাখাল শসার) আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া ঐ মলম লাগাইয়া গজপুটে পাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

কৃষ্ণবর্ণ হীরকে, ওল, রশুন, শঙ্খ, মনঃশীলা সমপরিমিত বটের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

নীলা (নীলমণি)।

নীলমণি দুই প্রকার, জলনীল ও ইন্দ্রনীল। ইহার মধ্যে ইন্দ্রনীল মণিই শ্রেষ্ঠ! যে নীল মণির গর্ভে শ্বেত আভা দৃষ্ট হয় এবং যাহা লঘু, তাহাই জলনীল। আর যাহার গর্ভে কৃষ্ণ আভা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা ভারবিশিষ্ট, তাহাই ইন্দ্রনীল।

একবর্ণ বিশিষ্ট, গুরু,স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, পিণ্ডাকৃতি, মৃদু ও মধ্যদেশে জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট, এই সাত প্রকার নীলরত্ন উৎকৃষ্ট। জলনীলমণিও সাত প্রকার; যথা—কোমল অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ, বিহিত (অর্দ্ধাংশ একবর্ণ ও অর্দ্ধাংশ পঞ্চবর্ণ), রুক্ষ, ভারশূন্য, রক্তগন্ধযুক্ত, চ্যাপ্টা ও সূক্ষ্ম। নীলমণি—শ্বাস-কাসনাশক, বৃষ্য, ত্রিদোষনাশক. অগ্নিদীপক এবং বিষমজ্বর, অর্শঃ ও পাপ নিবারক। এতদ্ভিন্ন আরও একপ্রকার নীলমণি আছে তাহার নাম মহানীলা। এই নীল ১০০ গুণ দুগ্ধের মধ্যে রাখিলে ইহার বর্ণাধিক্য-বশতঃ ঐ দুগ্ধ নীলবর্ণ ধারণ করে।

নীলা উড়িষ্যার কতক অংশে এবং সিংহলে পাওয়া যায়।

গোমেদ।

গোমেদ মণির বর্ণ গোমেদের ন্যায়, এইজন্য ইহাকে গোমেদ বলা হয়। গোমূত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, সমগাত্র, গুরু-স্তরহীন, মসৃণ ও উজ্জ্বল, এই আট প্রকার গোমেদ মণি শুভফলপ্রদ। বিকৃতবর্ণ, লঘু, রুক্ষ, চ্যাপ্টা, ত্বকের ন্যায় আবরণযুক্ত, প্রভাহীন ও পীত কাচের ন্যায় বর্ণযুক্ত গোমেদ শুভজনক নহে।

গোমেদ মণি কফপিত্তনাশক, ক্ষয় ও পাণ্ডুরোগনাশক এবং অগ্নির উদ্দীপক, পাচক, রুচিকর, ত্বকের হিতকর ও বুদ্ধিবর্দ্ধক।

বৈদূর্য্য।

যে বৈদূর্য্য মণি শুভ্র আভাযুক্ত, শ্যামবর্ণ, সমগাত্র, স্বচ্ছ, গুরু ও উজ্জ্বল এবং যাহার মধ্যভাগে শুভ্র উত্তরীয়বৎ পদার্থ ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া

বোধ হয় তাহাই শুভজনক বলিয়া কীর্ত্তিত। আর জলবৎ শ্যামবর্ণ চিপিট (চ্যাপ্টা), লঘু কর্কশ ও যাহার ভিতর রক্তবর্ণ উত্তরীয়বৎ পদার্থ দৃষ্ট হয় তাহা প্রশস্ত নহে।

বৈদূর্য্য মণি রক্ত-পিত্তনাশক, প্রজ্ঞা, আয়ুঃ ও বলের বৃদ্ধিকারক, পিত্তপ্রধান রোগ নিবারক, অগ্নির উদ্দীপক ও মলনাশক।

রত্নশুদ্ধিঃ।

অম্লদ্রব্য দ্বারা মাণিক্য, জয়ন্তীপত্রের রস দ্বারা মুক্তা, ক্ষারবর্গ দ্বারা বিদ্রুম, গোদুগ্ধ দ্বারা মরকত, কুলত্থক্বাথ মিশ্রিত মদ্য বা কাঁজি দ্বারা পুষ্পরাগ, তণ্ডুলীয় (কাঁটা নটে) রস দ্বারা হীরক, নীল বৃক্ষের রস দ্বারা নীলমণি, গোরোচনার দ্বারা গোমেদ এবং ত্রিফলার জল দ্বারা বৈদূর্য্য মণি শোধিত হয়।

রত্নসকলের ভস্ম

মান্দারের রস, মনঃশীলা, গন্ধক ও হরিতালের সহিত মর্দ্দন করিয়া আটবার পুট দিলে হীরক ব্যতীত অন্যান্য রত্নসকল ভস্ম হইয়া যায়।

হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার সাচীক্ষার, সোহাগা. মাংস দ্রব (অম্লবেতস বিশেষ), অম্লবেতস, চূলিকালবণ, পক্বজয়পালফল, ভল্লাতক, দ্রবন্তী, রুদন্তীলতা, ক্ষীরবিদারী, চিতামূল এবং মনসাসীজের আটা ও আকন্দের আটা, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া তাহার একটী গোলক করিবে এবং সেই গোলকের মধ্যে নির্দ্দোষ ও শুভফলপ্রদ সুজাত রত্নসমূহ নিহিত করিবে, তৎপরে সেই গোলকের উপর ভূর্জ্জপত্র জড়াইয়া সূত্র দ্বারা তাহা বান্ধিবে। পুনর্ব্বার তাহার উপর বস্ত্র বেষ্টন করিয়া, সমুদয় অম্লদ্রব্য ও কাঁজিপূর্ণ হাঁড়ীতে দোলা যন্ত্রে পাক করিবে। তিন অহোরাত্র পর্য্যন্ত তীব্র অগ্নিতে স্বিন্ন করিয়া রত্ন সমূহ ধৌত করিয়া লইবে। অতঃপর

পুটপক্ক করিয়া সেই রত্নের ভস্ম গ্রহণ করিবে। রত্নভস্ম রত্নের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট, লঘু, দেহের দৃঢ়তাজনক এবং বিবিধ শুভফলপ্রদ।

মুক্তাচূর্ণ অম্লবেতসের সহিত এক সপ্তাহ মর্দ্দন করিয়া জামীরের মধ্যে নিহিত করিয়া, ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। এক সপ্তাহ পরে উহা বাহির করিয়া পুটপাক করিলে উহার ভস্ম প্রস্তুত হয়।

বজ্রবল্লীর (হাড়জোড়া) মধ্যে হীরক নিহিত করিয়া, অম্লদ্রব্যপূর্ণ ভাণ্ডে সপ্তাহকাল তাহা স্বিন্ন করিবে। পরে পুটপাক করিলেই হীরক ভস্মরূপে পরিণত হয়।

বৈক্রান্ত।

শ্বেতবর্ণ বৈক্রান্ত অম্লবেতসের রসে ভিজাইয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপে এক সপ্তাহকাল ভাবনা দিতে হইবে; তৎপরে কেতকীর স্বরস, সৈন্ধব লবণ, স্বর্ণপুষ্পী (স্বর্ণযূথী বা বিষলাঙ্গলীয়া) ও ইন্দ্রগোপকীট এই সকল দ্রব্য একটী হাঁড়ীতে রাখিয়া সেই হাঁড়ীর মধ্যে দোলাযন্ত্রে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত বৈক্রান্ত স্বিন্ন করিবে। এইরূপে বৈক্রান্ত ভস্ম প্রস্তুত হয়। অষ্টবিধ ধাতুতে হীরক প্রক্ষেপ দিয়া স্বিন্ন করিলে, সেই যোগ প্রভাবে তাহাও নিশ্চিত দ্রবীভূত হয়।

রত্নভস্ম কুসুম্ভ বীজের তৈল মধ্যে রাখিলে তাহা চিরকাল অবিকৃত থাকে। ঐরূপে রত্নভস্ম রাখিয়া প্রয়োজন কালে তাহা ব্যবহার করিবে।

রত্ন ধারণ করিলে, সূর্য্যাদি গ্রহের নিগ্রহ নিবারিত হয়, দীর্ঘায়ু ও আরোগ্যলাভ হয়, সৌভাগ্য জন্মে, ভাগ্যাধীনবিভব ও উৎসাহপ্রাপ্ত হওয়া যায়, ধৈর্য্য বৃদ্ধি হয়, কান্তিহীনতা ও প্রস্তর ধূলি প্রভৃতির সংসর্গ-জনিত অলক্ষ্মীনাশ ও ভূতাদি নিবারিত হয়।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণস্থ খনি সমূহে বৈক্রান্ত পাওয়া যায়।

বৈক্রান্তের শোধনবিধি।

কুলত্থকাথে তিন দিন সিদ্ধ করিলে বৈক্রান্ত শোধিত হইয়া থাকে।

বৈক্রান্তের স্বত্বপাতন।

বৈক্রান্তের ভস্ম, গুড়, গুগ্‌গুল, লাক্ষা, উস্ফল, পিন্যাক, রালা, লোম এবং ক্ষুদ্রমৎস্য ইহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া যথেষ্ট দুগ্ধসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক মুষাবদ্ধ করিয়া উত্তপ্ত করিলে বৈক্রান্তের স্বত্বনির্গত হয়।

বৈক্রান্তের ব্যবহার।

বৈক্রান্ত ভস্ম তাহার এক চতুর্থাংশ স্বর্ণভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া একরতি মাত্রায় প্রতিদিন পিপ্পলিচূর্ণ, ঘৃত, ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মা, পেটের যাবতীয় ব্যাধি, রক্তহীনতা ভগন্দর, অর্শঃ, হাঁপ, কাস, পুরাতন উদরাময়, প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দেহের শক্তি বর্দ্ধক।

স্ফটিক।

কয়েক প্রকারের স্ফটিক সাধারণতঃ দেখা যায়। মন্দকান্তি (লাক্ষা জ্যোতিঃবিশিষ্ট) স্ফটিক বিন্ধ্য পর্ব্বতের জঙ্গলে উৎপন্ন হয়। তাহাদের বর্ণ অশোকের কচি পল্লবসদৃশ অথবা দাড়িম্ববীজ সদৃশ। কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক সিংহলে উৎপন্ন হয়। পদ্মরাগ মণির খনিতে তিন প্রকার স্ফটিক উৎপন্ন হয়। উহারা প্রত্যেকে অত্যন্ত নির্ম্মল, স্বচ্ছ, এবং স্তরবিহীন। ইহাদের সাধারণ নাম জ্যোতিঃরস। ইহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ স্ফটিককে রাজাবর্ত্ত, নীলবর্ণবিশিষ্টকে রাজময় এবং যে স্ফটিকের গাত্রে ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় দাগ দেখিতে যাওয়া যায় তাহাকে ব্রহ্মময় স্ফটিক বলে।

স্ফটিকের গুণ।

ইহা নাতিশীতল নাতিউষ্ণ। ইহা পিত্ত, শোথ, রক্তদুষ্টি এবং ক্ষয়রোগে পরম হিতকর।

স্ফটিকনির্ম্মিত পাত্রে জল রাখিলে তাহা শীতল এবং পিত্তনাশকগুণ বিশিষ্ট হয়।

চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মনি।

সূর্য্যকান্ত মনি হিমালয়ের শিখর দেশে জন্মিয়া থাকে। ইহা সূর্য্য গ্রহের প্রিয়বস্তু। সূর্য্যকিরণ ইহার উপর পতিত হইলে ইহার মধ্যদেশ হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হয়। ইহা রত্নশ্রেষ্ঠ। চন্দ্রকান্ত মণি চন্দ্রগ্রহের প্রিয়বস্তু। ইহাও হিমালয়ের শিখরদেশে পাওয়া যায়। ইহা দুর্ল্লভ। ইহার উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইলে ইহার মধ্যস্থল হইতে অমৃত সদৃশ ক্ষমতাসম্পন্ন জলকণা বহির্গত হয়।

সূর্য্যকান্ত মণির গুণ ঃ—ইহা উষ্ণ, নির্ম্মল, রসায়ন, বাতশ্লেষ্ম হর ও মেধাজনক। এই রত্নধারণে রবিগ্রহ জনিত যাবতীয় দোষ নষ্ট হয়।

চন্দ্রকান্ত মণির গুণ ঃ—ইহা শীতল, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক। ইহা মহাদেবের প্রিয়বস্তু এবং গ্রহদোষ ও দুর্ভাগ্যনাশক চন্দ্রকান্ত-মণি হইতে যে জলকণা নির্গত হয় তাহা অতিশয় বিশুদ্ধ এবং পিত্তপ্রশমক।

প্রবাল সম্বন্ধে বিশেষ কথা।

(১) উৎকৃষ্ট প্রবাল রক্তশ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মৃদু ও মসৃণ, এবং ইহাকে সহজে বিদ্ধ করা যায়।

(২) তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুনসম্পন্ন প্রবাল জবাপুষ্প, সিন্দূর অথবা দাড়িমপুষ্পবৎ। ইহা কঠিন, মসৃণ নহে এবং ইহাকে সহজে বিদ্ধ করা যায় না।

(৩) ইহা অপেক্ষা হীনগুনসম্পন্ন প্রবাল পলাশ বা পারুল পুষ্প সদৃশ রক্তহরিৎবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা স্নিগ্ধ কিন্তু মসৃণ নহে।

(৪) ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রবাল রক্তকৃষ্ণবর্ণ। ইহা কঠিন এবং জ্যোতিঃবিশিষ্ট নহে। ইহাকে সহজে বিদ্ধ করা যায় না।

ব্যবহারযোগ্য প্রবালের লক্ষণ ঃ—বিশুদ্ধ প্রবাল রক্তবর্ণ, মসৃণ, স্নিগ্ধ, বিদারণযোগ্য, জ্যোতিঃবিশিষ্ট, গোলাকার ও স্থূল।

অব্যবহার্য্য প্রবালের লক্ষণ—পাণ্ডু, ধূসর, দাগবিশিষ্ট তাম্রাভ, ও লঘু।

প্রবালের গুন ঃ—প্রবাল ক্ষয়,পিত্ত, রক্তস্রাব কাশ, চক্ষুরোগ বিষদোষ ও ভূতদোষ নাশক। ইহা লঘু এবং পাচক।

কর্কেত

কর্কেতমণি শ্লীপদ এবং যাবতীয় স্পর্শজদোষনাশক। ইহা বর্ণভেদে সাতপ্রকার। তন্মধ্যে নীল ও শ্বেতবর্ণ কর্কেত হীণগুন বিশিষ্ট।

ভীস্মরত্ন

ইহা হিমালয় পর্ব্বতে পাওয়া যায়। ইহা সর্ব্ববিধ বিষনাশক। এই মণি হস্তে ধারণ করিলে ব্যাঘ্র, সিংহ, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর কোন ভয় থাকে না। ইহা জল, অগ্নি, দস্যু ও শত্রুভয় নিবারক। যে ভীস্মমণি শৈবালসদৃশ, এবং বলাকাপক্ষবর্ণবৎ কর্কশ, প্রভাহীন, পীতবর্ণ বিশিষ্ট এবং মলিন তাহা ব্যবহার্য্য নহে।

নীলমনির বিশেষ গুন

নীলমণি শ্বাস, কাস ও ত্রিদোষ নাশক, বৃষ্য, দীপন, বিষমজ্বর, অর্শঃ এবং পাপনাশক।

উপরত্ন

নানা প্রকারের উপরত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সাতপ্রকার প্রধান। যথা পালঙ্ক, রুধির, পুত্তিকা, তার্ক্ষ্য, পীলু, উপল, সুগন্ধিক। রত্নে যে সমস্ত গুন আছে উপরত্নে তাহার কিয়ৎ পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বরত্ন শোধন ও জারণের নিয়মানুসারে ইহাদিগকে শোধিত ও মারিত

করিবে। জারিত উপরত্ন সকল রসসংস্কারে এবং ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রহরত্ন

সূর্য্যগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে বৈদূর্য্যমণি চন্দ্র হইলে নীলকান্ত, মঙ্গল হইলে প্রবাল, বুধ হইলে পদ্মরাগ, বৃহস্পতি হইলে মুক্তা, শুক্র হইলে হীরক, শনি হইলে ইন্দ্রনীল, রাহু হইলে গোমেদ, এবং কেতু হইলে মরকত মণি ধারণ করিতে হয়।

গ্রহধাতু

সূর্য্যের তাম্র, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের গন্ধক, মনঃশীলা, হরিতাল, বুধের পারদ, স্বর্ণ, বৃহস্পতির হরিতাল ও গন্ধক, শুক্র বঙ্গ তাম্র ও রৌপ্য, শনির লৌহ ও সীসক, রাহুর লৌহ, কেতুর রাজপট্ট প্রশস্ত ধাতু।

গ্রহ ঔষধি

সূর্য্য বিরুদ্ধ হইলে বিল্ব মূল, চন্দ্রে ক্ষীরাই মূল, মঙ্গলে অনন্ত মূল, বুধে বৃদ্ধদারকের মূল, বৃহস্পতিতে ব্রহ্মজষ্টির মূল, শুক্রে সিংহপুচ্ছ (রাম বাসক) মূল, শনির বেড়েলা মূল, রাহুতে চন্দন ও কেতুতে অশ্বগন্ধা মূল ধারনীয়।

ক্ষার।

ক্ষার মাত্রেই মলনিষ্কাশক।

ক্ষারত্রয়

যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার ও সোহাগা।

ক্ষার চতুষ্টয়

সর্জ্জিক্ষার, ঔবরক্ষার যবক্ষার ও সোহাগা।

পঞ্চক্ষার

পলাশক্ষার, ঘণ্টাপারুলক্ষার, যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার ও তিলক্ষার। এই ক্ষারপঞ্চকের মধ্যে সোহাগা, সর্জ্জিক্ষার, ঔষরক্ষার ভূমি হইতে পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলি বৃক্ষভস্ম হইতে গ্রহণ করা হয়। নিশাদল ও ক্ষার বলিয়া অভিহিত। আমরা উপরস বর্ণনা কালে ইহা বর্ণনা করিয়াছি। ইহাতে পারদের কতকাংশ বিদ্যমান আছে।

নিম্নলিখিত বৃক্ষগুলির ক্ষার ঔষধে ব্যবহৃত হয় যথা:—

পলাশ, অশ্বথ, ঘণ্টাপারুল, ধব, মনসাসীজ, অপমার্গ, ছোলার গাছ আকন্দ, তেঁতুল, তিলঝাটি, (তিলের গাছ) যব, বাসক, দুরালভা, কণ্টকারী, মূলা, চিতা, পুনর্ণবা, আর্দ্রক।

উপর্য্যুক্ত ক্ষারগুলির মধ্যে যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার, নিশাদল ঔষর ক্ষার ও সোহাগা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষারের গুন।

ক্ষারসকল তীক্ষ্ণবীর্য্য, উষ্ণ, লঘু, দীপক, ক্লেদক, দাহকর, শোথ কারক, শেষ্মানাশক, ক্রিমিঘ্ন, ব্রণনাশক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক।

ক্ষারসকল পারদের মুখ উৎপাদনকারী, গুল্ম, অর্শ, শূল, বহুমূত্র, অশ্মরী, গ্রহণীনাশক। ক্ষারসমূহ পাচক কিন্তু রক্তপিত্ত কারক। অনেক সময় অস্ত্রপ্রয়োগ অপেক্ষা ক্ষারপ্রয়োগে অধিক সুফল লাভ হয়। অধিক ক্ষার সেবনে বীর্য্যক্ষয় হয়।

ক্ষার প্রস্তুতের সাধারণবিধি।

যে সকল বৃক্ষ বা পত্র হইতে ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা দিগকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভস্ম করিতে হইবে, পরে ঐ ভস্ম ষোলগুণ জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া মোটা কাপড়ে ৭ বার ছাকিয়া লইয়া ঐ জল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে থাকিবে, পরে জল অদৃশ্য হইলে নিম্নস্থ শ্বেত অংশ গ্রহণ করিবে।

যবক্ষারপ্রস্তুত বিধি।

যবের শুয়াগুলি পোড়াইয়া ১৬ গুণ জলে ভিজাইয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয় ইহাকে যবক্ষার কহে।

যবক্ষারের গুণ।

যবক্ষার কটু, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণ, সূক্ষ্ম, পাচক, সারক, মূত্রকারক, বাত শ্লেষ্মনাশক, আনাহ, গ্রহণী, পাণ্ডু, গুল্ম, অর্শঃ, শ্বাস, শূল, পীহা, হৃদ্‌রোগ, ও আমদোষনাশক। ইহা বহ্নিগুণবিশিষ্ট ও শুক্রনাশক।

ঊষরক্ষারের গুণ (পাকিমক্ষার বা নবসার।)

ইহা মেদনাশক ও বস্তিশোধক। ইহা বায়ুনাশক, ক্লেদক, বলনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, বিরেচক, কোমল, শীঘ্র শরীরের মধ্যে সর্ব্বস্থানে বিসর্পিত হয়, অল্প পিত্তবর্দ্ধক, লঘুপাচক ও উর্দ্ধগত বায়ুপ্রশমক। ইহা যক্ষা, উদর আনাহ, শূল গুল্ম, উদ্গার, আম, ও ক্রিমিনাশক।

মিশ্রক্ষার

ক্ষারব্যবসায়িগণ কখন কখন ক্ষার অধিক উৎপন্ন করিবার জন্য কর্দ্দমের সহিত ঘাসের ছাই মিশ্রিত করে এবং ঐ কর্দ্দম মিশ্রিত ভস্ম রাশি জলে গুলিয়া উপরিস্থিত তরল পদার্থ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করে। ইহাকে মিশ্রক্ষার কহে।

সর্জ্জিক্ষার।

কোন কোন পর্ব্বতে বা সন্নিহিত স্থান সমুহে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষার মিশ্রিত মৃত্তিকান্তর দৃষ্ট হয়। ইহাকে সর্জ্জিমাটি কহে। ইহাতে সর্জ্জিমৃত্তিকা ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। এই মৃত্তিকা চতুর্গুণ জলে গুলিয়া ঘন বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া পরিস্কৃত করিতে হয়; পরে ঐ তরল পদার্থ অগ্নিতে জ্বাল দিয়া ক্ষার গ্রহণ করা হয়। ইহাকে সর্জ্জিক্ষার কহে।

সর্জ্জিক্ষারের গুণ।

যবক্ষারের ন্যায় সর্জ্জিক্ষারের ও বহ্নিগুণ আছে। ইহা কটু, উষ্ণ, ও তীক্ষ্ণ; কফ ও বায়ুপ্রশমক। ইহা গুল্ম, আধ্মান, উদররোগ, ব্রণ, ক্রিমি, আনাহ, প্লীহাবৃদ্ধি ও যকৃৎনিসূদনকারী। ইহা শুক্র দোষনাশক।

কৃত্রিম সর্জ্জিক্ষার।

উল্লিখিত সর্জ্জিক্ষার অভাবে চিকিৎসকগণ কখনও কখনও দুরালভা বা ক্ষুদ্র দুরালভার ছাই হইতে সর্জ্জিক্ষার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন।

টঙ্কন।

উত্তর ভারতে ও তিব্বত দেশে শুষ্ক জলাশয়ের গর্ভে একপ্রকার মৃত্তিকামিশ্রিত ক্ষার দৃষ্ট হয় ইহাকে টঙ্কন কহে। ইহাকে জলে গলাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ছাঁকিয়া অগ্নিতাপে শুষ্ক করিলে পাত্রের তলদেশে পতিত হয়।

টঙ্কনের ভেদ।

টঙ্কন দুইপ্রকার পিণ্ড ও দানাবিশিষ্ট। পূর্ব্বটি অপেক্ষা শেষোক্তটী অধিক শ্বেতবর্ণ। পূর্ব্বটী তাদৃশ শ্বেতবর্ণ নহে।

টঙ্কনের গুণ।

পিণ্ড টঙ্কন কটু, উষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও বায়ু পিত্তবর্দ্ধক। ইহা কাস, শ্বাস, রজোরোধ, স্থাবরবিষ নষ্ট করে। ইহা দানা বিশিষ্ট টঙ্কন হইতে অল্পগুণ সম্পন্ন। শ্বেতবর্ণ বা দানা বিশিষ্ট টঙ্কন—কটু, উষ্ণ স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, সাদা, বিরেচক ও বলপ্রদানকারী, পাচক, শ্লেষ্ম ও বায়ু নাশক, ক্ষয়, আমদোষ ও বিষদোষনাশক। শ্বেত টঙ্কন পিণ্ডটঙ্কন অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

টঙ্কনশোধন বিধি।

টঙ্কনকে দগ্ধ করিয়া স্ফোটিত করিলে বিশোধিত হয়।

ক্ষার দুই প্রকার-তরল ও কঠিন।

দুইপ্রকার ক্ষার দেখা যায়, কঠিন ও তরল। কঠিন ক্ষার বাহ্য প্রয়োগ ও ঔষধের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়। এবং তরল ক্ষার কতিপয়রোগে কঞ্জি, মদ্য, দধি, দুগ্ধ তক্র ও ত্রিফলা ক্বাথের সহিত পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

ক্ষারদ্বয় ও ক্ষারত্রয়ের গুন।

সর্জ্জিকাক্ষার এবং যবক্ষার এই উভয়কে ক্ষারদ্বয় বলে। এই ক্ষার দ্বয়ের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাহাকে ক্ষারত্রয় বলে। এই তিনটি ক্ষারের যে যে গুন পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে দুইটী অথবা তিনটি ক্ষার একত্র মিলিত হইলেও তাহারা সেই সেই গুন প্রকাশ করে। বিশেষতঃ মিলিত ক্ষারদ্বয় বা ক্ষারত্রয় গুল্মরোগনাশের পক্ষে অতি উপযোগী।

ক্ষারাষ্টক।

পলাশ, সিজ, আপাঙ্গ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাল ও যব এই সাত দ্রব্যের ক্ষার এবং সর্জ্জিকাক্ষার এই আটটিকে ক্ষারাষ্টক বলে। ক্ষরাষ্টক—অগ্নিগুণবিশিষ্ঠ; ইহা গুল্ম ও শূলবিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

লবণ।

ছয় প্রকার লবণ সাধারণতঃ দেখা যায়—সামুদ্রলবণ, সৈন্ধব, বিড় সৌর্ব্বল, রোমক ও চুলিকা।

লবণের সাধারণ গুন।

লবণ শোধক, ও রুচিকারক, পাচক কফপিত্তবর্দ্ধক, পুরুষত্ব ও বায়ুনাশক। ইহা দেহের শৈথিল্য ও মৃদুতাকারক, বলঘ্ন, মুখে জলোৎপাদনকারী, কপোল ও গলদাহকারী।

অতি লবণসেবনের দোষ।

অতিরিক্ত লবণ সেবন করিলে চোখউঠা, রক্তপিত্ত, অস্ত্রক্ষত, বলি পলিত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

সামুদ্রলবণ।

ইহা পাচক, তীক্ষ্ণ, লঘু, রোচক ও সারক, ক্ষারগুণযুক্ত, কফপিত্ত বর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

সৈন্ধব।

সৈন্ধব পর্ব্বতজাত লবণ ; পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে ইহা পাওয়া যায়। ইহা পাচক, শীতবীর্য্য, লবণমধুর, লঘু, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রোচক, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, সূক্ষ্মস্রোতগামী, কোষ্ঠকাঠিন্য ও ব্রণ নাশক।

বিড়

ইহা এক প্রকার কৃত্রিম লবণ। ইহা লবণরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ক্ষারযুক্ত, লঘু, পাচক, রুক্ষ, রুচিকারক, ব্যবায়ী, উর্দ্ধগত কফ ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, ক্ষুধা ও পিত্তবর্দ্ধক ও রেচক। ইহা শূল, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, গুল্ম, হৃদ্‌রোগে ও মেহরোগে শুভফলপ্রদ।

বিড়লবণ প্রস্তুতপ্রণালী।

(১) ৮২ ভাগ সমুদ্র লবণ, একভাগ হরিতকী, একভাগ আমলকী ও একভাগ সর্জ্জি (শোধিত) একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মৃৎপাত্রে তীক্ষ্ম অগ্নিতে যে পর্য্যন্ত পিণ্ডাকৃতি না হয় সে পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হয়।

(২) আটভাগ সামুদ্রলবণ একভাগ আমলকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃৎপাত্রে তীক্ষ্ণ অগ্নিতে পাক করিয়া শীতল হইলে বিড়লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সৌবর্চ্চল।

সচল লবণ—রুচিকারক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অত্যন্ত পাচক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, নাতিপিত্তকর, বিশদগুণযুক্ত, লঘু, উদ্গারশুদ্ধিকারক সূক্ষ্ম স্রোতগামী এবং বিবন্ধ, আনাহ ও শূল নিবারক। উষর ক্ষার ও এই লবণ প্রায় একই দ্রব্য। ইহাকে ক্ষার এবং লবণ উভয়ই বলা চলে। প্রস্তুতিবিধি ঔষর ক্ষারের বিধির ন্যায়।

রোমক।

রোমক—শাম্ভারি লবণ—লঘু, বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, সূক্ষ্মস্রোতগামী, অভিষ্যন্দী ও কটুবিপাক।

রাজপুতনায় জয়পুরে শাকম্ভরী নামে লবণ হ্রদ আছে। সমুদ্র জলের ন্যায় ইহার জল লবণাক্ত। এই জল হইতে উৎপন্ন লবণকে রোমক বলে।

চুলিকা লবণ।

নবসার ও চুলিকা লবণ একই দ্রব্য।

আরও তিন প্রকার লবণ দৃষ্ট হয়; কাচ লবণ বা কাল লবণ, দ্রোণী লবণ ও ঔষর লবণ।

কাল লবণ।

ইহা শূল, গুল্ম, কফ ও বায়ুবিনাশার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দ্রোণী লবণ।

ইহা ভেদক, কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শূলঘ্ন, কিঞ্চিৎ পিত্তজনক এবং বিদাহী।

ঔষর লবণ।

ঔষর লবণ—পিত্তজনক, মলসংগ্রাহক, ক্ষার, তিক্তরস, মূত্রকারক, বিদাহী, শোষকারক এবং কফবাতবিনাশক।

বিষ।

বিষ তিন প্রকার যথা—স্থাবর, জঙ্গম, ও গরবিষ।

প্রথমটি হইতে দশ প্রকার ও দ্বিতীয়টি হইতে ষোল প্রকার বিষ উদ্ভূত হইয়াছে। তৃতীয়টি বিরুদ্ধ ভোজনজনিত দোষ হইতে উৎপন্ন হয়; যথা দুগ্ধ ও মৎস্য, মাংস বা দুগ্ধ ও টক দ্রব্য একত্র ভোজন।

স্থাবর বিষ।

স্থাবর বিষ দশ প্রকার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যথা, শিকড়, পত্র, ফল, ফুল, ত্বক, বৃক্ষ বা গুল্মের আঠা, কাষ্ঠ, নির্য্যাস. ধাতু ও কন্দ। এই সকল বিষগুলির মধ্যে কন্দ বিষই শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার বিষ আঠার প্রকার যথা—সক্তুক, মুস্তক, শৃঙ্গী বালুক, সর্ষপ, বৎসনাভ, কূর্ম্ম, শ্বেত শৃঙ্গী, কালকূট, মেষশৃঙ্গী, হলাহল, দর্দ্দুর, কর্কট, মর্কট, গ্রন্থী. হরিদ্রা, রক্তশৃঙ্গ, ও কেশর। এই আঠারটীর প্রথম আটটি নির্দ্দেশ অনুসারে ব্যবহৃত হয় অপর দশটী বর্জ্জনীয়।

সক্তুক।

সক্তুক বা পুণ্ডরীক বিষ :—যে কন্দ বিষের মধ্যভাগ সক্তু নির্ম্মিত এবং শ্বেতবর্ণ তাহাকে সক্তুবিষ বলে। ইহা খুব উগ্র ও কার্য্যকরী।

মুস্তক।

ইহার ক্রিয়া মন্দগতিতে হয়। ইহা দ্বারা ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

শৃঙ্গী

এই বিষকন্দ গোশৃঙ্গে বাঁধিয়া দিলে তাহার দুগ্ধের বর্ণ রক্তবর্ণ হয়। এই কন্দ কৃষ্ণ পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট।

বালুক (সৈকত)

বালুক বিষকন্দের অভ্যন্তর বালুকাপূর্ণবৎ। ইহা দ্বারা জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

সর্ষপ

সর্ষপকন্দ হরিদ্রাবর্ণ এবং জ্বরঘ্ন। ইহার চুলের ন্যায় রোমরাজিই বিষাক্ত।

বৎসনাভ।

এই বিষকন্দ দেখিতে গোবৎসের নাভির ন্যায়। ইহা পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত হয়। ইহা দুই প্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণ। প্রথম প্রকার শীঘ্র কার্য্যকারী, লঘু ও রেচক। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টটি বিপরীতগুণবিশিষ্ট। উভয় প্রকারই ঔষধ ও রসায়নে প্রযুক্ত হয়।

বৎসনাভের গুণ।

বৎসনাভ—কটু, তিক্ত, ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক, আগ্নেয়, বেদনাঘ্ন অবসাদজনক, শূলঘ্ন ও অভিঘাত নাশক, বিসর্প ও বায়ুকফবৃদ্ধিজনিত রোগসকল, ত্রিদোষজ জ্বর, বাত ও হৃদ্‌রোগ সমূহে হিতজনক।

কূর্ম্ম।

যে বিষকন্দ কূর্ম্মাকৃতি বিশিষ্ট তাহাকে কূর্ম্মকন্দ বলে।

শ্বেত শৃঙ্গ।

শ্বেত শৃঙ্গ বা দার্ব্বিক দেখিতে শ্বেত বর্ণ শৃঙ্গের ন্যায় অথবা সাপের ফণার ন্যায়। ইহা গরুর শৃঙ্গে বাঁধিয়া দিলে তাহার দুগ্ধের রং রক্তের ন্যায় হয়।

কালকূট।

অশ্বথ বৃক্ষের ন্যায় এক প্রকার বিষতরু আছে। এই বৃক্ষের নির্য্যাসকে কালকূট বলে। ইহার আকৃতি ও বর্ণ কাকের চঞ্চুর ন্যায়। এই

বৃক্ষের কন্দ কৃষ্ণবর্ণ ও লেবুর ন্যায় গোলাকার। এই বিষ এত তীক্ষ্ণ যে কেবলমাত্র ইহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিলে মানবকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গবেড়, মালয় এবং কঙ্কনের পাহাড়ে এই বিষ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

মেষশৃঙ্গী

ইহার আকার মেষের শৃঙ্গের ন্যায়। গরুর শৃঙ্গে এই বিষ বাঁধিয়া দিলে তাহার দুগ্ধ রক্তবর্ণ ধারণ করে।

হলাহল

হলাহল বৃক্ষের ফল গরুর বাঁটের ন্যায়। ইহার একগোছা ফল দেখিতে তাল পত্রের ছাতার ন্যায়। এই বিষবৃক্ষের নিকটে কোনপ্রকার বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। ইহা সাধারণতঃ কিষ্কিন্ধ্যা, হিমালয় ভারতবর্ষের দক্ষিনোপকুলে ও কঙ্কণে পাওয়া যায়। ইহার কন্দ অতিবিষের কন্দের ন্যায়। ইহার বহির্ভাগ শ্বেতবর্ণ এবং অন্তর্ভাগ নীলবর্ণ।

দার্দ্দুর।

মলয় পর্ব্বত সন্নিধানে দার্দ্দুর নামক বিষবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মপুত্র ও কর্দ্দম নামেও অভিহিত হয়। ইহা কর্দ্দমের ন্যায় কপিলবর্ণ হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় বিষাক্ত।

কর্কট।

কর্কট বিষ বানরের বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং আকৃতি কর্কেটের ন্যায়। ইহার উপরে কতকগুলি রেখা দেখা যায় ঐ রেখার নিম্ন অংশ মৃদু এবং অন্য অপর অংশ কঠিন।

মূলক।

ইহা একপ্রকার শ্বেতকন্দ বিষ। ইহার আকৃতি মূলা এবং কুকুরের দন্তের ন্যায়। ইহাকে যম দংষ্ট্রা এবং সৌরাষ্ট্র দেশেজাত বলিয়া সৌরাষ্টী বলা হইয়া থাকে।

গ্রন্থি।

ইহা হরিদ্রাবর্ণের একপ্রকার কন্দ বিষ। ইহার বর্ণ কাল এবং ইহা অতিশয় বিষাক্ত।

হরিদ্রা।

ইহা এক প্রকার কন্দ বিষ—ইহার কন্দ হরিদ্রার ন্যায়। বিরাট দেশে জন্ম বলিয়া ইহাকে বৈরাটও বলা হইয়া থাকে। এই কন্দ বিষের উভয় প্রান্তভাগ গোলাকার। ইহার অন্তর্ভাগ হরিদ্রাবর্ণ।

রক্ত শৃঙ্গী।

এই কন্দবিষ গরুর নাসিকায় দিলে তাহার নাসিকা হইতে রক্তপাত হয়। এবং ইহার আকৃতি গরুর স্তনের ন্যায়।

প্রদীপন।

ইহা এক প্রকার কন্দ বিষ, ইহার আকার শুষ্ক আদ্রকের ন্যায় রক্তবর্ণ; ইহা শরীরে কোন স্থলে স্পর্শ করিলে সে স্থান তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া উঠে।

বিষের ব্যবহার।

কালকুটাদি দশপ্রকার বিষ রসকার্য্যে, বিষ প্রস্তুতে এবং লৌহ তাম্রাদি ধাতুকে স্বর্ণে পরিণতকরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহারা কখনও ঔষধে ব্যবহৃত হয় না। সক্তুক, মুস্তক, শৃঙ্গী, কালকুট, সর্ষপ, বৎসনাভ, কূর্ম্ম, শ্বেতশৃঙ্গ এই কয়েকটি বিষ, বিশেষরূপে শোধিত করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়।

বিষ বর্ণভেদে চারিপ্রকার—শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ। ইহারা যথাক্রমে পরপর হীন গুণযুক্ত যথা শ্বেত হইতে রক্তহীন ইত্যাদি।

শ্বেতবর্ণ বিষ রসায়ন, রক্তবর্ণ বিষ রসকার্য্যে প্রয়োজনীয়, পীতবর্ণ বিষ কুষ্ঠনাশক, কৃষ্ণবর্ণ বিষ মৃত্যুপ্রদ।

শ্বেতবর্ণ বিষ ঔষধে প্রয়োগ করিবে। রক্তবর্ণ বিষ বিষভক্ষণ জনিত বিকার নিবারণ জন্য প্রয়োগ করিবে। পীতবর্ণ বিষ ক্ষুদ্র রোগে প্রয়োগ করিবে। কৃষ্ণবর্ণ বিষ সর্প দষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিবে।

বিষের সাধারণ দোষ।

বিষ—রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু, ব্যবায়ী, বিকাসী, বিসর, দুষ্পাচ্য। রুক্ষগুণ হেতু ইহা বায়ু প্রকোপক, উষ্ণ গুণ হেতু পিত্ত প্রকোপক এবং রক্তদুষ্টিকারক, তীক্ষ্ণ গুণ হেতু ইহা মোহ উৎপাদক এবং দেহ বন্ধন শিথিলকারী, সূক্ষ্মগুণ হেতু অতি শীঘ্র শরীরের সমস্ত অংশে ব্যাপ্ত হয়। এবং তাহাদিগকে বিকল করে। আশুগুণ হেতু শীঘ্র প্রাণ নাশ করে। ব্যবায়ীগুণ হেতু পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়াই সমস্ত শরীরে ক্রিয়া প্রকাশ করে। বিকাসী গুণ হেতু ত্রিদোষ, সপ্ত ধাতু এবং মলকে নষ্ট করে। বিসর গুণ হেতু অধিক বিরেচণ করিয়া থাকে এবং লদ্ধপাকীগুণ হেতু ঔষধপ্রয়োগ করিয়া বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে কোন ফললাভ হয় না। অবিপাকী গুণ হেতু বিষ দুর্জ্জর, এবং চিরকাল ক্লেশদায়ী। স্থাবর, জঙ্গম, কৃত্রিম এই তিনপ্রকার বিষই এই সকল গুণ বিশিষ্ট বলিয়া শীঘ্র প্রাণ নাশ করে।

স্থাবর বিষ সেবনজনিত দোষ।

স্থাবর বিষ সেবন করিলে জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলগ্রহ, লালাস্রাব, বমি, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

সহসা বিষ সেবনের ফলঃ—সহসা শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে প্রথমে চর্ম্মের বিবর্ণতা তৎপর কম্পন উপস্থিত হয়, তৎপরে দাহ উপস্থিত হয়, তৎপর সর্ব্বাঙ্গ বিকৃত হয়, তাহার পর মুখ হইতে ফেন, নির্গত হয়, তাহার পর স্কন্ধদ্বয় ভগ্ন হয়, তাহার পর সর্ব্বাঙ্গ নিস্তব্ধ হয় এবং সর্ব্বশেষে মৃত্যু হয়।

চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসক এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিলে কৃতকার্য্য হইবেন।

বিষ সেবন জনিত বিকারের চিকিৎসা।

(১) বিষ ভক্ষণের পর বিকার উপস্থিত হইলে চিকিৎসক সর্ব্ব প্রথমে রোগীকে বমন করাইবার চেষ্টা করিবেন। এই বমন কার্য্যে ছাগদুগ্ধ সেবন প্রশস্ত। যে পর্য্যন্ত না বমন আরম্ভ হয় সে পর্য্যন্ত ছাগ দুগ্ধ সেবন করাইতে হইবে। প্রত্যেকবার বমির পর পুনরায় ছাগ দুগ্ধ সেবন করাইতে হইবে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত না বমি বন্ধ হয় সে পর্য্যন্ত ছাগ দুগ্ধ সেবন করাইতে হইবে। এইরূপে যখন দেখা যাইবে যে আর বমি হইতেছেনা তখন জানিবে যে রোগী বিষ বিমুক্ত হইয়াছে।

(২) বিষক্রিয়া হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবার চেষ্টা করিবে এবং বমন করাইতে করাইতে যে পর্য্যন্ত না পিত্ত নির্গত হয় সে পর্য্যন্ত বমন করাইবে। এই বমন কার্য্যে শিলাপিষ্ঠ ময়নাফল সৈন্ধব লবণ ও রাই সরিষা বাঁটা, ছাগদুগ্ধ, মাছধোয়া জল সেবন করান প্রশস্ত। এইরূপ বমন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে রোগীকে বিরেচন করান আবশ্যক। বিরেচন কালে যে পর্য্যন্ত না আম নির্গত হয়, সে পর্য্যন্ত বিরেচন করাইবে। এইরূপে বিরেচন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে গব্য ঘৃত পান করাইবে। কারণ গব্য ঘৃতই সর্ব্বাপেক্ষা বিষঘ্ন এবং জীবনীশক্তি বর্দ্ধক।

(৩) **নিম্নলিখিত যোগগুলি ব্যবস্থা করিলে সত্বর বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।** কাঁটা নটের রস ও হরিদ্রার (কাঁচা) রস একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

গন্ধনাকুলী (সর্পাক্ষি) অথবা সোহাগা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

পুত্রঞ্জীবের (জিয়াপুতা) রস লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। অথবা উক্তদ্রব্যদ্বয়কে অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে বিষ ক্রিয়া নষ্ট হয়।

(৪) **নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিষক্রিয়া নাশকঃ** জাতী, নীলী, ঈশ্বরীমূল, কাকমাছি, অপরাজিতা, ত্রিফলা, করবী, কুষ্ঠ, যষ্টিমধু, জীরা, সকল ক্ষীরবৃক্ষের ছাল, এলাচি, এবং গব্য ঘৃত।

(৫) অতিরিক্ত বিষ ক্রিয়া হইলে গব্যঘৃতের সহিত ভৃঙ্গরাজ, দধি, বজ্রক্ষার (বাজবৃক্ষের ক্ষার), অনন্তমূল, কাঁটানটের মূল, ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু সেব্য। অথবা ঘৃতমধু সহ অর্জ্জুনছাল চূর্ণ সেব্য। অথবা সোহাগা ও কাঁটানটের মূলের রস মধুসহ সেব্য।

প্রশস্ত বিষের গুন।

বিষ যথাশাস্ত্র প্রয়োগ করিলে মুমূর্ষু রোগীরও প্রাণ দান করে। ইহা রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষঘ্ন, বৃংহন ও বীর্য্যবর্দ্ধক। প্রশস্ত বিষে যে দোষ আছে তাহা শোধন করিলে অপগত হয়। সুতরাং সকল প্রকার বিষকে শোধন করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

কন্দ বিষের সংগ্রহকাল।

ফল পাকিলে কন্দবিষ গ্রহণ করিবে। ইহা টাট্‌কা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কারণ কিছুদিন রৌদ্র বাতাস লাগিলে ইহার গুণ

নষ্ট হয়। সুতরাং ইহাকে সুপক্ব অবস্থায় গ্রহণ করিয়া, রাই সরিষার জলে বস্ত্র খণ্ড সিক্ত করিয়া তদ্বারা জড়াইয়া রাখা আবশ্যক।

কন্দবিষের শোধন বিধি।

(১) প্রথমতঃ কন্দবিষের ছাল ছাড়াইয়া ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ২৪ ঘণ্টা গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, পরে তাহাকে প্রবল রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই শোধিত হয়। শুষ্ক হওয়ার পর উহা গুঁড়া করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া ঔষধে ব্যবহার করা হয়।

(২) দোলাযন্ত্রে উক্ত বিষ ২৪ ঘণ্টা পাক করিলেও শোধিত হয়।

কন্দবিষের মারন বিধি।

সমপরিমিত শোধিত সোহাগার সহিত মর্দ্দন করিলে কন্দবিষ মারিত হয়।

প্রসঙ্গ ক্রমে সোহাগার শোধন বিধি

সোহাগাকে অগ্নিতাপে ফুটাইয়া খৈ করিয়া লইলে শোধিত হয়। সোহাগার সহিত মর্দ্দিত বিষ সেবন করিলে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না।

বিষ সেবন-যোগ্য পাত্র।

বিষ যোগবাহী এবং রসায়ন। যে ব্যক্তি নিয়মিত রূপে ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন করেন ও মিতাচারী এবং রসায়ন সেবনের নিয়মগুলি যথার্থরূপে পালন করেন তিনি শোধিত বিষ সেবনের উপযুক্ত পাত্র।

বিষ সেবনের অযোগ্য পাত্র।

যে ব্যক্তি ক্রোধশীল, যাহার পিত্তাধিক্য আছে, যিনি ক্লীব এবং ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত ও রুক্ষশরীরবিশিষ্ট, যাহার ক্ষয়রোগ হইয়াছে, যিনি গর্ভিনী, এবং বালক ও বৃদ্ধ ইহারা সকলেই বিষ সেবনের অযোগ্য পাত্র।

বিষসেবনের নিয়ম।

বিষসেবন করিবার পূর্ব্বদিবস রোগী অশ্বগন্ধা, গোজিহ্বা ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত পারদভস্ম অথবা বদ্ধ পারদ (গন্ধকের সহিত) সেবন করিবে। পরদিবস হইতে বিষভক্ষণ আরম্ভ বিধেয়।

বিষসেবীর নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালনীয়,—

(১) তিনি স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিবেন—

(২) সুস্থচিত্তে ও চিন্তাশূন্য হৃদয়ে ভোজন করিবেন—

(৩) গব্যঘৃত ও দুগ্ধ সংযুক্ত শালি তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিবেন, ও শীতলজল পান করিবেন।

(৪) তিনি ছাগরক্ত, জাঙ্গল্যপশুর মাংস, মদগুর মৎস্য ও চিনি, মধু, দুগ্ধ এবং যাবতীয় শীতবীর্য্য দ্রব্য এবং শাস্ত্রোক্ত হিতকর দ্রব্য সকল ভক্ষণ করিবেন।

নিয়মিত রূপে নিত্য বিষসেবনে শরীর জরাও ব্যাধি মুক্ত হইয়া সবল ও সুস্থ হয়। বিষসেবী সংযত হইয়া উল্লিখিত নিয়মগুলি অবশ্য পালন করিবেন। শীত ও বসন্ত কালই বিষ সেবনের পক্ষে প্রশস্ত। বর্ষাকালে এবং দুর্য্যোগাদির দিনে কদাপি বিষসেবন করিবে না। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে গ্রীষ্মকালেও বিষ সেবন করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ষাকালে ইহা কদাপি সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

বিষসেবনের মাত্রা।

শোধিতবিষ প্রথমদিবস এক সর্ষপ মাত্রায় সেব্য, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসের মাত্রা তিন সর্ষপ। নবমদিবসের মাত্রা চার সর্ষপ। দশম দিবস হইতে এক সর্ষপ করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ ছত্রিশ সর্ষপ অর্থাৎ ১ রতি পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রা ব্যবহার বিধেয়। সুস্থ ব্যক্তি ১ যব বা ছয় সর্ষপ পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিবে। কুষ্ঠরোগী প্রত্যহ ১ গুঞ্জা বা ছত্রিশ সর্ষপ

পরিমিত অর্থাৎ পূর্ণমাত্রা সেবন করিবে। নিয়মিতরূপে এই বিষ ১ মাস সেবন করিলে অষ্টপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

বিষ এইরূপে ছয় মাস সেবন করিলে মানব পরম সৌন্দর্য্যবান হয়। ইহা এক বৎসর সেবনে সর্ব্বরোগ নাশ ও দুইবৎসর সেবনে দিব্য দেহ লাভ হয়।

বিষসেবনে পথ্য।

বিষসেবন কালে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল হিতকর যথা ঃ—ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, গোধূম, সিদ্ধ তণ্ডুল, মরিচ, সৈন্ধব, মিষ্টদ্রব্য ও শীতলজল। বিষ সেবীর শীত প্রধান দেশ শীতঋতুও শীতলজল উপকারী।

বিষসেবনে অপথ্য।

বিষসেবী নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সযত্নে পরিত্যাগ করিবেন যথা ঃ—কটু, অম্ল, লবণ, তৈল, দিবা নিদ্রা, অগ্নি ও রৌদ্র সেবা। বিষ সেবন কালে ঘৃত বিহীন অন্ন সেবন করিলে চক্ষুরোগ, চর্ম্ম রোগ ও নানা প্রকার বায়ু রোগ জন্মে।

বিষের প্রয়োগ।

বাতজ্বরে—দধি মস্তরসহিত শোধিত বিষ সেব্য।

পিত্তজ্বরে—দুগ্ধের সহিত।

কফজ্বরে—ছাগমূত্রের সহিত।

ত্রিদোষজজ্বরে—ত্রিফলার জলের সহিত।

জীর্ণজ্বরে—লোধ, চন্দন, বচ, চিনি, ঘৃত, মধু ও দুগ্ধের সহিত।

সর্ব্বকার জীর্ণজ্বর, প্রমেহ ও চর্ম্ম রোগে—দন্তীমূল, ত্রিবিৎ, ত্রিফলা, ঘৃত ও মধু সহ।

বিষমজ্বরে (ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বরে)—শিখিকর্ণের (নীলকণ্ঠ বাসক) রসের সহিত।

রক্তপিত্তে—যষ্টি মধু, রাস্না, উশীর, উৎপল, এই সকল দ্রব্য একত্র চাল ধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া বিষ সেবন করিবে। শ্বাস ও কাসে—রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, গুলঞ্চ, পদ্ম কাষ্ঠ ও ত্রিকটু সহ সেব্য।

হিক্কায়—চিনি, দুগ্ধ, পারদ ভস্ম, প্রবাল ভস্ম, ও যষ্টি মধুর সহিত সহিত সেব্য।

বমনেচ্ছায় বা ছর্দ্দিতে—দুগ্ধ, উশার, মধু, যবক্ষার, হরিদ্রা ও কুটজের সহিত।

যক্ষ্মায়—চ্যবনপ্রাশের সহিত সেব্য।

গ্রহণী রোগে মুথা, ইন্দ্রযব, পাঠা, চিতা, ত্রিকটু, অতিবিষা, ধাইফুল, মোচরস, আমের আঁটির শস্য সহযোগে।

মূত্রকৃচ্ছে,—হরীতকী, চিতামূল, দ্রাক্ষা, বাসক, ও হরিদ্রা সহ।

অশ্মরী ও উদাবর্ত্তে—শিলাজতু ও ত্রিকটু সহযোগে এবং গোমূত্র সৈন্ধব লবণ ও পাথরকুচির পাতার রসের সহিত বিষ মর্দ্দন করিয়া সেব্য।

গুল্মে—সর্জ্জিক্ষার ও ত্রিফলার সহিত।

শূলে—পিপুল চূর্ণের সহিত।

প্লীহা বৃদ্ধিতে—দ্রবন্তী, রাস্না, দ্রাক্ষা, শঠী, পিপ্পলী, অতিবিষা, বিড়ঙ্গ, মৌরি ও যবক্ষারের সহিত অথবা, শুল্‌ফা বিড়ঙ্গ ও দুগ্ধের সহিত।

কুষ্ঠে—কাকমাছির রসের সহিত।

জঙ্গম বিষ।

সর্ব্ব প্রকার জঙ্গম বিষের মধ্যে সর্প বিষই ঔষধার্থে সমধিক প্রযোজ্য। একটি বলবান—যুবা কৃষ্ণ সর্প (কেউটে) হইতে বিষ গ্রহ করিবে। বৃদ্ধ কৃষ্ণসর্প বা অন্য সর্পের বিষ ঔষধার্থে গ্রাহ নহে।

রক্ত অর্কপুষ্প মধুর-রস, তিক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্লেষ্মা, অর্শ, বিষ ও রক্ত পিত্তনাশক। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, গুল্মে এবং জলোদরে বিশেষ উপকারক।

লাঙ্গুলী।

লাঙ্গুলী বিরেচক, কুষ্ঠ, জলোদর, অর্শ, স্ফোটক এবং শূলরোগে উপকারক। ইহা ক্ষার বিশিষ্ট, ক্রিমি ও কাস নাশক। ইহা তিক্ত, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ পিত্তকর এবং গর্ভনাশক।

লাঙ্গুলীর শোধন।

গোমূত্রে একদিন ভিজাইয়া রাখিলে লাঙ্গুলী শোধিত হয়।

গুঞ্জা।

শ্বেত ও রক্তভেদে গুঞ্জা দুই প্রকার। উভয় প্রকার গুঞ্জাই কেশের পক্ষে হিতকর এবং বায়ু, পিত্ত ও জ্বরনাশক। উহারা মুখশোষ, শীরো-ঘূর্ণন, শ্বাস, মদাত্যয়, এবং চক্ষুরোগ নাশক। উহারা স্ফোটক, দদ্রু, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠনাশক। উভয় প্রকার গুঞ্জার মূল এবং শ্বেত গুঞ্জার বীজ বমিকারক। উভয় প্রকার গুঞ্জাই শূলে এবং বিষদোষে উপকারক।

গুঞ্জার শোধন।

উভয় প্রকার গুঞ্জাই ৩ ঘণ্টা কাঁজিতে সিদ্ধ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

শ্বেত গুঞ্জার ব্যবহার।

বিষাক্ত শস্ত্রদ্বারা উৎপন্ন ব্রণ, শ্বেতগুঞ্জার পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিলে এবং ঐ পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

করবী।

পুষ্পের বর্ণভেদে করবী পাঁচ প্রকার যথা ঃ—শ্বেত, রক্ত, পীত, পাটল ও কৃষ্ণ। সর্ব্বপ্রকার করবীই তিক্ত, কষায়, কটু, ব্রণনাশক, নেত্ররোগ,

কুষ্ঠ ও ক্ষতরোগে হিতকারী। তাহারা উষ্ণবীর্য্য এবং ক্রিমি ও দদ্রুরোগে হিতকর। শ্বেত, পীত ও রক্ত করবী ঘোটক মারক। পাটল বর্ণের করবী শিরোরোগ নাশক এবং বায়ু ও কফ নাশক। পূর্ব্বদিকে জাত শ্বেত করবীর মূল সর্পবিষনাশক। গোদুগ্ধে দোলাযন্ত্রে একপ্রহর পাক করিলে করবী শোধিত হয়।

বিষমুষ্টি। (কুঁচিলা)।

কুঁচিলা শীতবীর্য্য, তিক্ত, ঈষৎ বায়ুবর্দ্ধক মত্ততাজনক, লঘু, অতিশয় বেদনার শান্তি কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তশ্লেষ্মানাশক ও রক্তপিত্তঘ্ন।

বিষমুষ্টির শোধন বিধি।

দুই প্রহর দোলাযন্ত্রে কাঁজিতে বা গোময় জলে পাক করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলে বিষমুষ্টি শোধিত হয়!

ধুস্তুর।

ধুস্তুর মত্ততাকারক, বর্ণ, ক্ষুধা ও বায়ু বৃদ্ধিকারক। ইহা জ্বর ও কুষ্ঠনাশক। ইহা কষায়মধুর, উষ্ণবীর্য্য ও গুরু। ইহা উৎকুন, ফোড়া, শ্লেষ্মা, দদ্রু, ক্রিমি, কণ্ডু ও বিষনাশক।

ধুস্তুরের শোধন।

চারপ্রহর কাল গোমূত্রে স্বিন্ন করিয়া লৌহদণ্ডের দ্বারা খলে নিস্তুষ করিলে ধুস্তুর শোধিত হইয়া থাকে।

জয়পাল।

জয়পাল গুরু, স্নিগ্ধ, বিরেচক, পিত্তকফনাশক। অশুদ্ধ অবস্থায় বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে ইহা প্রাণ নাশ করে।

জয়পালের শোধন।

জয়পালের খোঁসা ছাড়াইয়া দুগ্ধে বা মহিষের বিষ্ঠা মিশ্রিত জলে দোলা যন্ত্রে ১ দিন সিদ্ধ করিয়া লইয়া মধ্যের পত্রবৎ অংশ ফেলিয়া দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে ইহা শোধিত হইয়া থাকে। শোধিত জয়পালকে

লেবুর রসে ভাবনা দিয়া লইলে উহা বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে।

ভল্লাতক।

ভল্লাতক ফল বিপাকে মধুর, লঘু, কষায় রস, পাচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ছেদি, বিরেচক, মেদনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, স্মৃতিশক্তিবৃদ্ধিকর, ক্ষুধা বৃদ্ধিকর, শ্লেষ্মা, বায়ু, ব্রণ, উদররোগ, কুষ্ঠ, অর্শ, গুল্ম, গ্রহণী, জলোদর, বদ্ধবায়ু, জ্বর ও ক্রিমিনাশক। ভল্লাতকের বোঁটা (বৃন্ত) মধুর, পিত্ত নাশক, কেশ প্রসাধক এবং অগ্নিবৃদ্ধি কর। উহা উষ্ণ, শুক্র বৃদ্ধিকর, কফ ও বায়ুনাশক, সর্ব্বপ্রকার উদররোগ, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী গুল্ম, জ্বর, শ্বেতকুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণনাশক।

ভল্লাতককে থেৎলা করিয়া সুর্কীর মধ্যে দুই দিন রাখিয়া ধুইয়া লইলে শোধিত হয়।

নির্ব্বিষা।

ইহা মুথার ন্যায় একপ্রকার ঘাস। ইহা জমির আইলের ধারে ধারে জন্মায়। ইহা কটু, শীতল, ব্রণ রোপক, শ্লেষ্মা, বায়ু, রক্তদুষ্টি এবং, নানাপ্রকার বিষদোষ নাশক।

ইহার মূল গ্রহণ করিয়া কপালে তিনবার বুলাইলে তৎক্ষণাৎ শিরোব্যথা দূর হয়।

অতিবিষা।

ইহা উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত, পাচক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, কফনাশক, পিত্ত, অতিসার বিষ, আম ও বমি নাশক। অতিবিষা ও নির্ব্বিষা দুগ্ধে সিদ্ধ করিলে শোধিত হইয়া থাকে।

অহিফেন।

ইহা তিক্ত, মত্ততা ও নিদ্রা কারক, বেদনা নাশক ও আক্ষেপন (খিল ধরা) নাশক, স্পর্শশক্তি বিনাশক, কফ ও শ্বাস নিবারক, ক্ষুধা

বর্দ্ধক, এবং বায়ু ও পিত্ত বৃদ্ধি কারক, ধাতু শোষক, রুক্ষতা কারক, দাহ এবং মেহ বর্দ্ধক। অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে গ্রহণী ও অতিসারে হিতকর। স্বাস্থ্য ও সুখ ভোগ করিয়া দীর্ঘজীবী হইতে হইলে অধিক দিন অহিফেন সেবন করা উচিত নয়।

আদার রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে ইহা শোধিত হয়।

জয়া (সিদ্ধি)।

জয়া কফ নাশক, তিক্ত, ক্ষুধাবর্দ্ধক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, প্রমেহ মত্ততা, বাক্‌শক্তি, মৈথুনেচ্ছা, নিদ্রা ও হাস্য কারক। ইহা ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, মদাত্যয়, অতিরজঃ ও সুতিকা রোগে হিতকর।

জয়ার শোধন।

বাবলা ছালের ক্বাথে সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিয়া গোদুগ্ধে ভাবনা দিলে ইহা শোধিত হয়। অথবা গোদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে ভাজিলে শুদ্ধ হয়।

উপবিষ বিকারের শান্তি।

অহিফেন—(১) ৪ তোলা কাঁটানটে মূলের রস সেবন করিলে অহিফেন সেবন জনিত বিকারের শান্তি হয়।

(২) সৈন্ধব লবণ পিপুল ও মদনফল বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে উক্ত বিকার নষ্ট হয়।

(৩) সোহাগা ও তুঁতে ঘৃতসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে প্রচুর পরিমাণে বমি হইয়া অহিফেন সেবন জনিত বিষের শান্তি হয়।

ধুতুরা—(১) ৪ তোলা বেগুণের রস সেবন করিলে ধুতুরা সেবন জনিত বিকার নষ্ট হয়।

(২) কার্পাস বীজ ও ফুলের ক্বাথ অথবা লবণ মিশ্রিত জল পান

করিলে অথবা /১ দুগ্ধ ৮ তোলা চিনি সহ পান করিলে ধুতুরা বিষ নষ্ট হয়।

ভল্লাতক—মাখনের সহিত মেঘনাদের রস মালিস করিলে অশুদ্ধ ভল্লাতক সেবন ও স্পর্শ জনিত শোথ নষ্ট হয়। অথবা দেবদারু, মুথা সর্ষপ ও মাখন একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে ভল্লাতক সেবন জনিত বিকার শান্তি হয়। অথবা মাখন; তিল বাঁটা, দুগ্ধ ও ঝোলাগুড় একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে অশুদ্ধ ভল্লাতক সেবন ও স্পর্শ জনিত শোথের শান্তি হয়।

জয়া—শুঁঠচূর্ণ দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সিদ্ধি সেবন জনিত বিকার নষ্ট হয়।

গুঞ্জা—চিনি ও দুগ্ধের সহিত মেঘনাদের রস সেবন করিলে গুঞ্জা সেবন জনিত বিকার নষ্ট হয় অথবা মধু খর্জ্জুর, তেঁতুল দ্রাক্ষা, অম্ল-দাড়িম ও আমলকী একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উক্ত বিকার নষ্ট হয়।

করবী—আকন্দের ছাল, দধি ও মিছ্‌রী একত্র মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে করবী বিষ নষ্ট হয়।

স্নুহী—(১) মিছ্‌রী ভিজান শীতল জল পান করিলে অথবা তেঁতুল পাতা বাটিয়া সেবন করিলে স্নুহী বিষ নষ্ট হয়।

(২) গিরিমাটি জলে ঘষিয়া সেবন করিলে আকন্দও সুহী বিষ নষ্ট হয়

জয়পাল—চিনি ও দধির সহিত ধনে বাঁটিয়া সেবন করিলে জয়পাল সেবন জনিত বিকার নষ্ট হয়।

শোধনীয় অপর কতিপয় দ্রব্যের শোধন বিধি।

গুগ্‌গুলু—গুগ্‌গুলুর কেশ মলাদি বিক্ষেপ পূর্ব্বক উহাকে উষ্ণ দশমূলের ক্বাথে নিক্ষিপ্ত ও আলোড়িত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া প্রচণ্ড সূর্য্য তাপে শুকাইয়া ঘৃতাক্ত করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। ইহাতে গুগ-

গুলু বিশোধিত হয়। অথবা গুলঞ্চের ক্বাথে নিসিক্ত করিয়া সূর্য্য তাপে শুষ্ক করিয়া লইলেও ইহা শুদ্ধ হয়। কিংবা গুগ্‌গুলুকে গোদুগ্ধে বা ত্রিফলা ক্বাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেও শোধিত হইয়া থাকে।

বিদ্ধড়কে - বীজ ঈষৎ সৈন্ধবযুক্ত জলে অথবা অপামার্গের ক্বাথে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। অথবা দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া বিদ্ধড়ক বীজ শোধিত করিবে। লেবুর বাজ, সজিনা বীজ, কার্পাস বীজ, অপমার্গ বাজ ও অপ-মার্গের ক্বাথে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। কিন্তু ইহাতে লবণ দিতে হইবে না। কট্‌কী, শ্বেতঘোষাবীজ, দন্তিবীজ, ঝিঙ্গাবীজ, রাখাল শশার বীজ, তিতলাউবীজ, কাকঠটীবীজ ও মাকালফল ইহারা আমলকীর রসে এবং করঞ্জবীজ ও নাটাকরঞ্জবীজ ভৃঙ্গরাজ রসে শোধিত হইয়া থাকে।

যন্ত্র

দোলা যন্ত্র—একটী হাঁড়ির অর্দ্ধভাগ দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া, তাহার মুখের দুই পার্শ্বে ছিদ্র করিবে এবং সেই ছিদ্র পথে একটী দণ্ড প্রবেশ করাইয়া, সেই দণ্ডে রস পোটলী ঝুলাইয়া বাঁধিবে, এইরূপ স্বেদন যন্ত্রকে দোলা যন্ত্র বলে।

স্বেদনী যন্ত্র—একটী জলপূর্ণ হাঁড়ির মুখে একখণ্ড বস্ত্র বাঁধিবে এবং তাহার উপর পাকের বস্তু রাখিয়া, সর্ব্বোপরি একখানি শরা আচ্ছা-দন দিবে। এইরূপ যন্ত্রকে স্বেদনী যন্ত্র বলা হয়।

পাতনা যন্ত্র—দুইটী ভাণ্ড দ্বারা পাতনা যন্ত্র প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে উপরের ভাণ্ডটী জলাধার ; ইহার গলদেশের নিম্নভাগ আট অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট, দশ অঙ্গুলি বিস্তার ও চারি অঙ্গুলি উচ্চ হওয়া

আবশ্যক। এই ভাণ্ডটী ষোড়ষাঙ্গুলি বিস্তৃত পৃষ্ঠ দেশ বিশিষ্ট অপর একটী ভাণ্ডের মুখে বসাইয়া উভয়ের সন্ধিস্থল মহিষী দুগ্ধ, মণ্ডুর চূর্ণ ও মাৎগুড় দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। ঐ নিম্নের ভাণ্ডটীর মধ্যে পারদ রাখিতে হয় এবং উপরের ভাণ্ডে জল থাকে। এই যন্ত্র চুল্লীতে বসাইয়া জ্বাল দিলে, নিম্ন ভাণ্ডস্থ পারদ উর্দ্ধ গত হইয়া উপরের ভাণ্ড তলে সংলগ্ন হয়। ইহাকেই পাতনা যন্ত্র বলে। (উপরিস্থ ভাণ্ডের জল উত্তপ্ত হইলেই তাহা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক)।

অধঃ পাতন যন্ত্র—এই যন্ত্রের উপরিস্থ পাত্রের মধ্য দেশে পারদ লিপ্ত করিতে হয়, এবং সেই পাত্রটী আর একটী জলপূর্ণ পাত্রের উপর উবুড়ভাবে বসাইয়া সংযোগ স্থল পূর্ব্ববৎ বদ্ধ করিবে। তৎপরে সেই উপরিস্থ পাত্রের উপর বন ঘুটে জ্বালিয়া তাপ দিলে, উপরের পারদ নিম্নস্থ হাঁড়ীর জলে পতিত হয়। ইহার নাম অধঃপাতন যন্ত্র।

কচ্ছপ যন্ত্র—একটী জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একখানি খাপরা রাখিয়া, তাহার উপরে বিড় মিশ্রিত পারদ কোষ্ঠীকাযন্ত্রে করিয়া স্থাপন করিবে এবং তাহার উপর একখানি পাতলা লৌহ কটোয়া আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থলে ছয় বার উত্তম রূপে লেপ দিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত জল-পাত্রের চারিধারে খদির বা কুল কাঠের অঙ্গার জ্বালিয়া দিবে। মর্দ্দিত পারদ এইরূপে কচ্ছপ যন্ত্র মধ্যে স্বিন্ন হইয়া জারিত হয়। অন্যান্য সত্ত্বও এইরূপ প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত হয়।

দীপিকা যন্ত্র—কচ্ছপ যন্ত্রের মধ্যদেশে একটি প্রদীপ রাখিয়া সেই প্রদীপে পারদ রাখিবে। তৎপরে অগ্নি জ্বালিয়া দিলে, সেই পারদ কচ্ছপ যন্ত্র মধ্যে পতিত হইবে। ইহাকে দীপিকা যন্ত্র বলে।

ঢেকী যন্ত্র—একটি ভাণ্ডের কণ্ঠদেশের নিম্নে একটি ছিদ্র করিবে এবং সেই ছিদ্রে একটি বাঁশের নলের এক মুখ প্রবেশ করাইবে। দুইটি কাংস্য পাত্রের মধ্যে জল পুরিয়া সম্পুট করতঃ তাহাতেও একটি

ছিদ্র করিবে এবং সেই ছিদ্রপথে পূর্ব্বোক্ত নলের অপর মুখ প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। যথোপযুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত পারদ সেই ভাণ্ডে রাখিবে এবং উভয় পাত্রের সংযোগস্থল গুলি দৃঢ় রূপে বদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে সেই ভাণ্ডের নীচে অগ্নিতাপ দিলে ভাণ্ডস্থ পারদ ঐ নল দ্বারা কাংস্য পাত্রস্থ জলে আসিয়া পতিত হইবে। কাংস্য পাত্র যতক্ষণ পর্য্যন্ত উষ্ণ বোধ হইবে, ততক্ষণ তাহার মধ্যে পারদ পতিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। এই যন্ত্র ঢেকী নামে বর্ণিত হয়।

জাগরা যন্ত্র—দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দুইটি লৌহের মূষা প্রস্তুত করিয়া, তাহার একটিতে অল্প ছিদ্র করিবে। সেই ছিদ্রযুক্ত মুষাতে গন্ধক এবং অপরটিতে পারদ রাখিবে। গন্ধকের মূষাটি পারদের মুষায় উপর স্থাপন করিয়া সন্ধি বদ্ধ করিবে। পারদ ও গন্ধক উভয় দ্রব্যই বস্ত্র গালিত রসুন রস দ্বারা আপ্লাবিত করিতে হইবে। তৎপরে সেই মূষাদ্বয় রুদ্ধ করিয়া একটি জলপূর্ণ হাঁড়ীতে রাখিবে ও তাহার উপর আর একটী হাঁড়ী আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকাও বস্ত্র দ্বারা উত্তম রূপে লিপ্ত করিবে। অতঃপর কপোত পুটের মধ্যে সেই যন্ত্র নিহিত করিয়া তাহার নীচে ও উপরে বন ঘুটের আগুণ জ্বালিয়া দিবে। অথবা চুল্লীর উপর বসাইয়া নীচে তীব্র জ্বাল দিতে থাকিবে। তিনদিন জ্বাল দেওয়ার পর, যখন চুল্লী ও হাঁড়ীর জল আপনা হইতে শীতল হইবে, সেই সময়ে যন্ত্র উন্মুক্ত করিতে হইবে। চুল্লী ও জল উত্তপ্ত থাকিতে শীতল ক্রিয়া করিবে না। উহা আপনা হইতে শীতল হইলে যন্ত্রস্থিত পারদ ক্ষার প্রাপ্ত হয় না বা তাহা উড়িয়া যায় না; এই নিয়মে গন্ধকেরও জারণ হয়।

বিদ্যাধর যন্ত্র ও কোষ্ঠীকা যন্ত্র—একটী হাঁড়ীর উপর আর একটী হাড়ী উপুড় করিয়া দিয়া সন্ধিস্থল প্রলিপ্ত করিলে তাহাকে বিদ্যাধর যন্ত্র বলে। ইহা চতুর্ম্মুখ চুলীর উপর বসাইয়া জ্বাল

দিতে হয়। নিম্নস্থ ভাণ্ডে ঔষধ রাখিয়া, উভয় ভাণ্ডের মুখবন্ধ করিবে। ইহাকে কোষ্ঠীকাযন্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়।

সোমানল যন্ত্র—উপরে অগ্নি ও নীচে জল রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে পারদ পাক করিলে, তাহা সোমানল যন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে অভ্রাদি ও জারিত হয়।

গর্ভযন্ত্র—পিষ্টিকা ভস্ম করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। মৃত্তিকা দ্বারা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ ও তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত মূষা প্রস্তুত করিয়া তাহার মুখটি গোলাকার করিতে হইবে। কুড়ি ভাগ লৌহ ও একভাগ গুগগুলু মসৃণ রূপে মর্দ্দিত করিয়া, তাহার দ্বারা মূষাটী বার বার লিপ্ত করিবে। পরিশেষে অর্দ্ধভাগ লবণ মিশ্রিত মৃত্তিকা ও জল দ্বারা লেপ দিবে। অতঃপর সেই মূষার মধ্যে পারদাদি রুদ্ধ করিয়া, ভূমিগর্ভে তুষাগ্নি দ্বারা মৃদু স্বেদ দিতে হইবে। অহোরাত্র বা তিনরাত্র পর্য্যন্ত এইরূপ স্বিন্ন করিলে, পারদ ভস্ম রূপে পরিণত হয়।

হংসপাক যন্ত্র—একখানি খাপড়া বালুকা পূর্ণ করিয়া,তাহার উপর আর একখানি খাপরা বসাইবে। তাহাতে পঞ্চক্ষার, মূত্র, লবণ বা বিড় দ্রব্য সহ পাচ্য পদার্থ স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। বার্ত্তিককারগণ ইহাকে হংসপাক যন্ত্র কহেন।

বালুকা যন্ত্র—একটী গূঢ়মুখ কাচকূপীর গাত্রে মৃত্তিকার ও বস্ত্র দ্বারা এক অঙ্গুলি পুরু লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে। এই কাচকূপীর দুই তৃতীয়াংশ পারদাদি পাচ্য পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই কাচ কূপি বিতস্তি গভীর বালুকা পূর্ণ একটী ভাণ্ডে নিহিত করিবে এবং ভাণ্ডের শূন্য বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া, ভাণ্ডের উপরে একখানি আচ্ছাদন দিবে ও সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা রুদ্ধ করিবে। তৎপরে সেই ভাণ্ড চুল্লীতে স্থাপন করিয়া জ্বাল দিতে হইবে, উপরের আচ্ছাদনের পৃষ্ঠে তৃণ নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ তাহা দগ্ধ না হইবে ততক্ষণ জ্বাল দেওয়া আবশ্যক, ইহাকেই বালুকা যন্ত্র

বলে। বালুকার পরিবর্ত্তে লবণ পূর্ণ করিলে তাহা লবণ যন্ত্র নামে অভিহিত হয়। ভাণ্ডে পাঁচ আঢ়ক বালুকাপূর্ণ করিয়া তাহাতে রস গোলকাদি পাক করিলে, তাহাকেও বালুকা যন্ত্র বলা যায়।

লবণ যন্ত্র—বালুকা যন্ত্রে বালুকার পরিবর্ত্তে লবণ পূর্ণ করিলে তাহাকে লবণ যন্ত্র বলা হয়।

তাম্র পাত্র মধ্যে পারদ প্রলিপ্ত করিয়া, সেই পাত্রের মুখে আচ্ছাদন দিয়া মৃত্তিকা ও লবণ দ্বারা তাহার সন্ধিস্থল রুদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ তাম্র পাত্র একটী ভাণ্ডে নিহিত করিয়া, ভাণ্ডটী লবণ বা ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে এবং পূর্ব্ববৎ নিয়মে তাহার নীচে অগ্নিজ্বাল দিতে হইবে। ইহাই লবণ যন্ত্র। পারদ সংস্কার কার্য্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

নালিকা যন্ত্র—একটী লৌহ নির্ম্মিত নলের মধ্যে পারদ নিহিত করিয়া তাহা লবণ পূর্ণ ভাণ্ডে স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ পাককরিবে। ইহাকে নালিকা যন্ত্র বলে।

ভূধর যন্ত্র—একটী গর্ত্ত বালুকাপূর্ণ করিয়া সেই বালুকার মধ্যে রসযুক্ত মূষা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর বন ঘুঁটের আগুন জ্বালিয়া দিলে তাহা ভূধর যন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

পুট যন্ত্র—একখানি শরায় পাচ্য দ্রব্য রাখিয়া তাহার উপর আর একখানি শরা উপুড় করিয়া চাপা দিবে এবং সন্ধিস্থল উত্তমরূপে রোধ করিবে। ইহারই নাম পুট যন্ত্র। চুল্লী মধ্যে বন ঘুটের আবরণ দিয়া পুট যন্ত্র স্থিত পারদ দুই প্রহর কাল পাক করিতে হয়।

কোষ্ঠী যন্ত্র ও খলচরী (খেচরী) যন্ত্র—ধাতু সমূহের সত্ত্ব পাতনার্থ কোষ্ঠী যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা একহস্ত দীর্ঘ ও ও ষোল অঙ্গুলি বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। দুইটি লৌহময় পাত্র প্রস্তুত

করিয়া তাহাতে একটি বলয় (বেড়) করিতে হইবে। একটী পাত্রের বলয় মধ্যে আর একটী পাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ ভাবে পাত্র দুইটি প্রস্তুত করিতে হইবে। ক্ষুদ্র পাত্রটীতে মূর্চ্ছিত পারদ রাখিয়া, সেই পাত্র বড় পাত্রটীর মধ্যে বসাইবে এবং বড় পাত্রটী কাঁজির দ্বারা পূর্ণ করিবে। ইহারই নাম কোষ্ঠীকাযন্ত্র। দুই প্রহর কাল এই যন্ত্রে স্বিন্ন করিলে, পারদ উত্থাপিত হয়। ইহা খেচরী যন্ত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রপাক দ্বারা পারদের ষড়গুণতা সম্পাদিত হয়। সূক্ষ্ম কান্ত লৌহের হইলে পারদ অধিকতর গুণশালী হইয়া থাকে।

তির্য্যক পাতন যন্ত্র—একটী কলসের মুখে বক্রীকৃত নলের একমুখ সংযুক্ত করিবে এবং সেই নলের অপর মুখ আর একটী কলসের কুক্ষি দেশ ছিদ্র করতঃ তাহাতে প্রবিষ্ট করাইবে। ঘটদ্বয়ের মুখও নল সংযুক্ত স্থানগুলি মৃত্তিকাদ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। ইহারই নাম তির্য্যকপাতন যন্ত্র। ইহারই একটী কলসে পারদ এবং অপর কলসে স্বাদু শীতলজল রাখিতে হয়। পারদের কলসের নীচে তীব্র তাপ দিলে সেই পারদ উত্থিত হইয়া নল দ্বারা অপর কলসে জলে আসিয়া পতিত হয়।

পালিকা যন্ত্র—একটী লৌহনির্ম্মিত গোলাকার পান পাত্রে উর্দ্ধভাবে একটী অবনতাগ্র দণ্ড সংলগ্ন করিলে, তাহা পালিকা যন্ত্র নামে বর্ণিত হয়। গন্ধক জারণের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ঘট যন্ত্র—চারিপ্রস্থ জলধারণের উপযুক্ত এবং চারি অঙ্গুলি পরিমিত মুখবিশিষ্ট ঘট বিশেষের নাম ঘট যন্ত্র। ইহা আপ্যায়ন যন্ত্র নামেও অভিহিত হয়।

ইষ্টকা যন্ত্র—একটী গোলাকার গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে একখানি শরা বসাইবে। গর্ত্তের চারিধারে এক অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া একটী

বেড় দিতে হইবে। একটী ইষ্টক খণ্ডের মধ্য স্থলে একটী গর্ত্ত করিয়া, সেই ইষ্টক খানি ঐ শরার মধ্যে নিহিত করিবে। ইষ্টক মধ্যস্থ গর্ত্তে পারদ রাখিয়া তাহার উপর একখণ্ড বস্ত্র এবং বস্ত্রের উপর গন্ধক দিতে হইবে। তৎপরে আর একখানি শরা উপুড় করিয়া আচ্ছাদন দিবে এবং শরায় ও গর্ত্তপার্শ্বস্থ বেড়ের সংযোগ স্থল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। ইহার নাম ইষ্টকা যন্ত্র বনঘুটের আগুনে কাপোতে পুটে (মৃদু জ্বালে) ইহাপাক করিতে হয়। এই যন্ত্রে গন্ধক জারণ ও সম্পাদন হইয়া থাকে।

হিঙ্গুলাকৃষ্টি বিদ্যাধর যন্ত্র—একটী হাঁড়ীতে হিঙ্গুল রাখিয়া তাহার উপর আর একটী বসাইয়া সংযোগ স্থল রুদ্ধ করিবে। উপরের হাঁড়ীতে জল এবং নীচের হাঁড়ীতে জ্বাল দিতে হইবে। ইহাকে হিঙ্গুলাকৃষ্টি বিদ্যাধর যন্ত্র বলে। উপরের হাঁড়ীর উত্তপ্ত হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া শীতল জল পূর্ণ করা আবশ্যক।

ডমরু যন্ত্র—একটী হাঁড়ীর উপর আর একটী হাঁড়ী উপড় ভাবে বসাইয়া সংযোগস্থল রুদ্ধ করিলে ডমরু যন্ত্র বলা যায়। ইহা পারদ ভস্ম করিতে ব্যবহৃত হয়।

নাভি যন্ত্র—একখানি শরার অভ্যন্তরে চারিদিকে মৃত্তিকা দিয়া মধ্যস্থলে গর্ত্তাকার করিবে, তন্মধ্যে পারদ ও গন্ধক রাখিয়া তাহার চারিধারে এক অঙ্গুলি উচ্চ বেড় দিবে এবং তাহার উপর গোস্তনাকৃতি একটী মূষা আচ্ছাদন করিয়া জল ও মৃত্তিকা দ্বারা তাহার সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। বাবলার ক্বাথ লেহবৎ ঘন করিয়া তাহার সহিত জীর্ণ কিট্টের (মণ্ডুরের) সূক্ষ্ম চূর্ণ, গুড় ও চূণ এই সকল পদার্থ মর্দ্দন করিলে তাহা জলমৃৎনামে অভিহিত হয়। এই পদার্থের প্রলেপ দিলে তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। খড়ি, লবণ ও

মণ্ডূর মহিষী দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিলে, তাহাকে বহ্নি মৃৎস্না বলে।

এই বহ্নি মৃৎস্না দ্বারা প্রলেপ দিলে, তাহা তীব্র তাপ সহ্য করিতে পারে। এই বহ্নি মৃৎস্না দ্বারা রুদ্ধ হইলে পারদ নির্গত হইতে পারে না। উক্তরূপে মূষার সংযোগস্থল রুদ্ধ করিয়া, সেই শরায় জল নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার নিম্নে তাপ দিবে (অগ্নিজ্বাল দিবে)। ইহাকে নাভি যন্ত্র বলে। এই যন্ত্র দ্বারা পারদ জীর্ণ হয়, এবং গন্ধক ধূমহীন ও শুদ্ধ হইয়া থাকে।

গ্রস্তযন্ত্র—একটী মূষা অপর একটী মূষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে; উভয় মূষারই আদ্যন্ত অবয়ব গোলাকার হইবে। কেবল তলভাগ চ্যাপ্টা করিতে হইবে। ইহাকে গ্রস্তযন্ত্র বলা হয়। পারদ বন্ধনার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্থালীযন্ত্র—একটী হাঁড়ীতে তাম্রাদি ধাতু নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার মুখে আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থল রুদ্ধ করিবে এবং হাঁড়ীর নিম্নদেশে অগ্নি জ্বাল দিবে। ইহার নাম স্থালীযন্ত্র।

ধূপযন্ত্র—আট অঙ্গুলি পরিমিত এবং আট অঙ্গুলি উন্নত একটী লৌহ পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার কণ্ঠদেশের অধোভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জলাধার স্থাপন করিয়া তদুপরি কয়েকটী সূক্ষ্ম লৌহ-শলাকা তির্য্যগভাবে স্থাপিত করিবে এবং সেই জলাধারের নিম্নে ধূপন পদার্থ নিহিত করিবে। সেই সকল শলাকার উপর সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র স্থাপন করিয়া, আর একটী পাত্র উপুড় ভাবে আচ্ছাদন দিবে এবং সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা রুদ্ধ করিবে। তৎপরে লৌহ পাত্রের তলদেশে অগ্নি জ্বাল দিতে হইবে। এইরূপ বিধানে সমুদয় স্বর্ণপত্র জারিত হইবে। অর্থাৎ তৎ সংলগ্ন পারদ উড়িয়া যাইবে এবং স্বর্ণ দ্রবীভূত হইয়া পাত্রগর্ভে পতিত হইবে।

গন্ধক, হরিতাল, ও মনঃশিলার কজ্জলী অথবা জারিত সীসক, এই কয়েকটী পদার্থ স্বর্ণপত্রের ধূপনার্থ প্রশস্ত। রৌপ্য জারণার্থ রৌপ্যের পত্রে জারিত বঙ্গের অথবা উপযুক্ত মত অন্য উপরস সমূহের ধূপ প্রদান করিতে হয়। ইহাকে ধূপযন্ত্র কহে। জারণ ক্রিয়া সাধনের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

কন্দুক যন্ত্র—একটী স্থূল হাঁড়ী জলপূর্ণ করিয়া মুখে একখণ্ড বস্ত্র দৃঢ়রূপে বান্ধিবে। সেই বস্ত্রখণ্ডের উপরে স্বেদ্য বস্তু স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটী আচ্ছাদন দিয়া মুখ রুদ্ধ করিবে। তৎপরে হাঁড়ীতে অগ্নির জ্বাল দিবে। ইহার নাম কন্দুক যন্ত্র। কেহবা ইহাকে স্বেদনী যন্ত্রও বলিয়া থাকেন। অথবা জলপূর্ণ হাঁড়ীর উপর তৃণ নিক্ষেপ করিয়া সেই তৃণের উপর স্বেদ্য দ্রব্য স্থাপন পূর্ব্বক আচ্ছাদন দিবে, এবং হাঁড়ীর নীচে পূর্ব্ববৎ অগ্নি জ্বাল দিবে। ইহাকেও কন্দুক যন্ত্র বলা যায়।

খল্বযন্ত্র—নীল বা শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ, দৃঢ় ও গুরু প্রস্তর খল্ব প্রস্তুতের উপযুক্ত। খলের পরিমাণ উচ্চতায় ষোড়শ অঙ্গুলি, বিস্তারে নয় অঙ্গুলি এবং দৈর্ঘ্যে চব্বিশ অঙ্গুলি করিতে হইবে। খলের ঘর্ষণী (নোড়া) দ্বাদশ অঙ্গুলি অথবা খল বিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং দশ অঙ্গুলি উচ্চ অর্থাৎ বেধবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এইরূপ খলই পারদ মর্দ্দনে শ্রেষ্ঠ। পারদাদি মর্দ্দনে সুবিধার জন্য দুই প্রকার (দীর্ঘাকৃতি ও গোলাকৃতি) খল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সকল খল ও তাহার পুত্রিকা নিরুদ্গার (যাহা হইতে দ্রব্য ছটকাইয়া পড়ে না) এবং মসৃণ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

মতান্তরে—দশ অঙ্গুলি উচ্চ, ষোড়শ অঙ্গুলি দৈর্ঘ্য, দশ অঙ্গুলি বিস্তৃত তলদেশ সাত অঙ্গুলি এবং স্থূলতায় দুই অঙ্গুলি পরিমিত খল প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা মসৃণ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হওয়া উচিত। ইহার নোড়া দ্বাদশ অঙ্গুলি প্রস্তুত করিবে ইহা কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রস্তুত।

মর্দ্দন বিষয়ে গোলাকার খলই অধিক সুবিধাজনক তাহা দ্বাদশ অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং চারি অঙ্গুলি নিম্ন হওয়া আবশ্যক। অত্যন্ত মসৃণ প্রস্তরে এই খল প্রস্তুত করাইয়া তাহার মধ্যভাগ ভালরূপে মসৃণ করিবে, ইহার নোড়ার নিম্নভাগ চ্যাপ্টা এবং ধরিবার স্থান সুখকর করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

লৌহ খল নয় অঙ্গুলি বিস্তৃত, ছয় অঙ্গুলি নিম্ন করিতে হয়। নোড়া আট অঙ্গুলি দীর্ঘ হওয়া উচিত। খলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটী চুল্লী অঙ্গার পূর্ণ করিয়া উপরোক্ত লৌহ খল তাহাতে স্থাপন করিয়া হাপর দ্বারা আধ্মাপিত করিলে তাহা তপ্ত খল্ব নামে অভিহিত হয়। মর্দ্দিত পারদ পিষ্টীক্ষার ও অম্ল পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঐ তপ্ত খল্লে স্বিন্ন করিলে তাহা অতি শীঘ্র দ্রবীভূত হয়। লৌহ ঘন কান্ত লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, পারদ কোটীগুন অধিক গুনশালী হইয়া থাকে।

মূষা

রসশাস্ত্রবিৎপণ্ডিতগণ মূষাকে ক্রৌঞ্চিকা, কুমুদী, করভাদিকা, পাচনী ও বহ্নিমিত্রা এইকয় নামে অভিহিত করেন। মৃত্তিকা ও লৌহ এই দুইটি পদার্থ মূষার উপাদন। মূষা ও তাহার আচ্ছাদন উভয়ের মিলন স্থান রুদ্ধ করাকে বন্ধন, সন্ধিলেপন, অন্ধ্রণ রন্ধ্রণ, সংশ্লিষ্ট ও সন্ধি বন্ধন কহে।

পাণ্ডু, রক্তবর্ণ, স্থূল, শর্কর হীন ও বহুক্ষণ অগ্নিতাপ সহনক্ষম মৃত্তিকা মূষা নির্ম্মাণার্থ প্রশস্ত। অভাবে বল্মীক মৃত্তিকা (উঁয়ীমাটী) বা কুম্ভকার-গণের নির্ম্মিত মৃত্তিকা মূষার্থ গ্রহণ করিবে।

মৃত্তিকার সহিত দগ্ধ তুষ, শণ, গোবর বা ঘোড়ার নাদ মিশ্রিত করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা তাহা কুট্টিত করিবে। এইরূপে সাধারন মূষার মৃত্তিকা প্রস্তুত করিতে হয়।

শ্বেত প্রস্তর চূর্ণ, দগ্ধতুষ, গোবর, শণ, ছিন্নবস্ত্র, অশ্বাদির বিষ্ঠা ও লৌহমলাদি পদার্থ, উপযুক্ত পরিমাণে মূষা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।

মৃত্তিকা তিনভাগ, শণ ও অশ্বাদির বিষ্ঠা দুইভাগ দগ্ধ তুষ ও প্রস্তর চূর্ণাদি একভাগ এবং লৌহমল অর্দ্ধভাগ এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া বজ্রমূষা প্রস্তুত করিতে হয়।

বজ্র মূষা—সত্বপাতন ক্রিয়ার ব্যবহৃত হয়।

যোগ মূষা—মসৃণ বল্মীক মৃত্তিকার সহিত দগ্ধ অঙ্গার, দগ্ধ তুষ ও যথা নির্দ্দিষ্ট বিড় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহার মূষা প্রস্তুত করিবে এবং যথা নির্দ্দিষ্ট বিড় দ্রব্য তাহাতে লেপন করিবে। এইরূপে যে মূষা প্রস্তুত হয়, তাহাকে যোগ মূষা কহে। এই যোগ মূষায় পারদ পাক করিলে তাহা অত্যধিক গুন শালী হয়।

বজ্রদ্রাবণিকা মূষা—গার সীসক সত্ব, শণ, ও দগ্ধ তুষ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্ব সমষ্টির সমান মূষোপযোগী পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা। এই সকল দ্রব্য মহিষী দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বজ্রদ্রাবনার্থ বিবিধাকৃতি মূষা নির্ম্মিত করিবে।

বর মূষা—বজ্র (লৌহচূর্ণ) অঙ্গার ও তুষ প্রত্যেক সমপরিমিত, মৃত্তিকা চতুর্গুণ, গার মৃত্তিকার সমপরিমিত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বরমূষা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা এক প্রহর কাল অগ্নিজ্বাল সহ্য করিতে পারে।

গারমূষা—মহিষীদুগ্ধ, ছয়গুণ গার, লৌহকট্টি, অঙ্গার ও শণ এই সকল দ্রব্যের সহিত কৃষ্ণমৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া, তাহা দ্বারা যে মূষা নির্ম্মিত হয়, তাহাকে গার মূষা বলে। এই মূষা দুই প্রহর কাল অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহা নষ্ট হয় না।

বর্ণমূষা বা রূপ্য মূষা—প্রস্তর চূর্ণ ও রক্তবর্ণ মৃত্তিকা

রক্তবর্গোক্ত দ্রব্যের রসের সহিত মর্দ্দিত করিয়া তাহা দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিবে এবং সেই মূষায় খদির ও হীরাকস লেপন করিবে। ইহাকে বর্ণ মূষা বলে। ধাত্বাদির বর্ণোৎকর্ষ সম্পাদনার্থ এই মূষা ব্যবহৃত হয় শ্বেত বর্গোক্ত পদার্থের সহিত মর্দ্দন করিয়া এই মূষা প্রস্তুত করিলে তাহাকে রৌপ্য মূষা বলা যায়।

বিড় মূষা—যথা নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকাদ্বারা মূষা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নির্দ্দেশানুসারে সেই সেই বিড় বস্তু লেপন করিবে, সেই মূষা বিড় নামে অভিহিত হয়। দেহের দৃঢ়তা সাধক ঔষধ প্রস্তুত করিতে এই মূষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গার (জলে বহুক্ষণ ভিজান মৃত্তিকা) ও সীসক সত্ত্ব এক এক ভাগ, তুষ আট ভাগ, সর্ব্ব সমষ্টির সমান মৃত্তিকা, এই সমস্ত একত্র মহিষী দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া, বহুপ্রকার ক্রৌঞ্চিকা যন্ত্র (মূষা) প্রস্তুত হয়। এই মূষায় মৎকুনের রক্ত এবং বালা ও কাঁটানটের মূল লেপন করিলে ইহা বজ্র দ্রাবণ মূষায় পরিণত হয়। ইহা দ্রব পদার্থ পূর্ণ করিয়া অগ্নি তাপে রাখিলে, চারি প্রহর কাল অগ্নিতাপ সহ্য করে।

মূষা মধ্যে কোন পদার্থ দ্রবীভূত, হইবার সময়ে কিছু ক্ষণের জন্য যদি তাহার আধ্মাপন ক্রিয়া বন্ধ রাখিয়া মূষা নামাইয়া লওয়া হয়,তবে তাহাকে মূষার আধ্মাপন ক্রিয়া বলে।

বৃন্তকা মূষিকা—বেগুণের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট মূষা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বার অঙ্গুলি পরিমিত একটী নাল সংযুক্ত করিবে। তাহার উপরি ভাগ ধুতুরা ফুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও সুদৃঢ় করিতে হইবে।

মূষার পরিমাণ আট অঙ্গুলি হইবে ও তাহাতে ছিদ্র থাকিবে। ইহাকে বৃন্তকা মূষিকা কহে। এই মূষা দ্বারা খর্পরাদি মৃদু দ্রব্যের সত্ত্ব আহরণ করিতে হয়।

গোস্তনীমূষা—যেমূষা গোস্তনের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং শিখাযুক্ত ও আচ্ছাদনযুক্ত তাহাকে গোস্তনী মূষা বলা যায়। ধাত্বাদির শুদ্ধি ও সত্ত্ব দ্রাবণ কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মল্লমূষা—একখানি শরার উপর আর একখানি শরা উপুড় করিয়া দিয়া যে মূষা প্রস্তুত হয় তাহাকে মল্লমূষা কহে। ইহা পর্পটাদি রস পদার্থ স্বেদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পক্কমূষা—কুম্ভকার নির্ম্মিত ভাণ্ডের ন্যায় আকৃতি প্রস্তুত করিয়া, তাহা দগ্ধ করিয়া লইলে, পক্কমূষা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পোট্টলী প্রভৃতি পাক করিতে এই মূষার প্রয়োজন হয়।

একটি গোলাকার মূষার মধ্যে পুটন দ্রব্য নিহিত করিয়া তাহার মুখবন্ধ করিলে, তাহাকে **গোলমূষা** কহে। ইহাদ্বারা পুটল দ্রব্য সত্বর দ্রবীভূত এবং শোধিত হইয়া থাকে।

তলভাগে কূর্পরের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং তৎপরে ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়া, স্থূল বৃন্তাকের ন্যায় যে স্থূল মূষা প্রস্তুত করা যায় তাহা **মহা মূষা** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লৌহ অভ্র প্রভৃতির পুট পাক ও দ্রাবণ ক্রিয়ার জন্য এই মূষা ব্যবহৃত হয়।

মণ্ডুকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং তলভাগে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ছয় অঙ্গুলি পরিমিত যে মূষা প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে **মণ্ডুক** মূষা বলে। এই মূষা ভূমিতলে নিহিত করিয়া উপরিভাগে পুট দিতে হয়।

যে মূষার মূলভাগ চিপিটাকৃতি (চ্যাপটা) ও অপর অবয়ব গোলাকৃতি, এবং আট অঙ্গুলি যাহার উচ্চতা, তাহাকে **মূসল** মূষা বলে। চক্রী বদ্ধ রস অর্থাৎ পারদের চাকী পাক করিতে এই মূষা উপযোগী।

পুট

পুট বিধানই রসাদি দ্রব্য পাকের জ্ঞাপক ; অর্থাৎ রসাদি দ্রব্যের পাক সম্যক হইয়াছে কিনা, পুটানুসারেই তাহা অবগত হইবে। নির্দ্দিষ্ট

পাক অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক পাক হিতকর নহে। যে ঔষধের পাক সম্যক বিহিত হয়, তাহাই হিতকর হইয়া থাকে। লৌহাদি ধাতু সমূহের নিরুত্থ ভস্ম, গুণের আধিক্য ও ক্রমশঃ উৎকর্ষ, জলে নিমগ্ন না হওয়া এবং অঙ্গুলি রেখার প্রবেশ এই সমস্ত কেবল পুট ক্রিয়া দ্বারাই সিদ্ধ হয়। পুট ক্রিয়া দ্বারাই প্রস্তর ও ধাতু সমূহের লঘুত্ব, শীঘ্র দেহ ব্যাপ্তি, অগ্নিদীপন, এবং জারিত পারদ অপেক্ষাও অধিক গুণশালী হইয়া থাকে।

বহিঃস্থ পুট সংযোগ দ্বারা, ধাতু সমুহে যতবার অগ্নি প্রবেশ করে এবং যতই তাহা চূর্ণরূপে পরিণত হয়, ততই তাহাদের গুণের আধিক্য হইয়া থাকে।

মহাপুট।

দুই হস্ত গভীর ও চতুষ্কোণ একটি কুণ্ড প্রস্তত করিয়া কুণ্ডের নিম্নভাগ ক্রমশঃ বিস্তৃত করিতে হইবে। তৎপরে সেই কুণ্ডের মধ্যে এক সহস্র বন ঘুঁটে দিয়া তাহার উপর মূষাবদ্ধ পুট পাকোপযাগী ঔষধ স্থাপন করিবে এবং ঔষধের উপরে আরও অর্দ্ধ সহস্র বনঘুঁটে দিবে। অতঃপর তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে হইবে। ইহাকে মহাপুট কহে।

গজপুট—এক হস্ত পরিমিত গভীর ও চতুষ্কোণ একটি কুণ্ড প্রস্তত করিয়া, সহস্র বনঘুঁটের দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। বন-ঘুঁটের উপর পুটন দ্রব্য পূর্ণ পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর আর অর্দ্ধ সহস্র বনঘুঁটে দিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগে করিবে। ইহার নাম গজপুট। গজপুট ঔষধের মহাগুণ প্রদান করে।

বরাহ, কুক্কুট ও কপোতপুট।

ঐরূপ নিয়মে অরত্নি পরিমিত কুণ্ড প্রস্তত করিয়া পুটপাক করিলে, তাহাকে বরাহ পুট বলা যায়।

দুই বিতস্তি পরিমিত গভীর ও দুই বিতস্তি বিস্তৃত কুণ্ডে পুটপাক করাকে কুক্কুট পুট বলে।

পারদ ভস্ম করিবার জন্য মূষারুদ্ধ করিয়া, ভূমিতলে আট খানি বনঘুঁটে দ্বারা পাক করিলে তাহাকে কপোত পুট বলে।

গোবর পুট।

গোচারণ স্থানে পতিত, গোখুর দ্বারা কুটিত ও শুষ্ক গোময় চূর্ণকে গোবর বলে। ইহা রস সাধন কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। রসভস্ম সাধনার্থ উক্তরূপ গোবর ও তুষ দ্বারা যে পুট প্রদত্ত হয়, তাহাকে গোবর পুট কহে।

ভাণ্ড পুট।

একটী স্থূল ভাণ্ডের মধ্যে তুষ পরিপূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে মূষা নিহিত করিবে এবং সেই তুষে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহা দগ্ধ করিবে। ইহাকে—ভাণ্ডপুট বলে।

বালুকাপুট—পাচ্য পদার্থ পূর্ণ মূষার নীচে ও উপরে উত্তপ্ত বালুকা দিয়া সেই মূষা আচ্ছাদিত করিয়া পাক করিবে। ইহার নাম বালুকা পুট।

ভূধর পুট—ভূমিতলে দুই অঙ্গুলি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মূষা নিহিত করিবে এবং তাহার উপরে বনঘুঁটের অগ্নিদ্বারা পুট দিতে হইবে। ইহাকে ভূধর পুট বলে।

লাবক পুট—মূষার উপরে ষোড়শ গুণ তুষ অথবা গোবর দ্বারা যে পুট প্রদত্ত হয়, তাহার নাম লাবকপুট। অতি মৃদু দ্রব্য পুটপাক করিতে ইহা উপযোগী।

যে স্থলে পুটের অর্থাৎ বনঘুঁটে প্রভৃতি দ্রব্যের পরিমান নির্দ্দিষ্ট না

থাকে, সেই সকল স্থলে পাচ্য পদার্থের বলাবল বিবেচনা করিয়া পুটের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে হয়।

রস-পরিভাষা।

কোন দ্রব পদার্থ না দিয়া, কেবল ধাতু সমূহ এবং গন্ধকাদির সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ মসৃণ চূর্ণ করিলে তাহা কজ্জলী নামে অভিহিত হয়। আর যদি ঐ সকল দ্রব্য দ্রব পদার্থের সহিত মর্দ্দিত হয় তবে তাহা **রসপঙ্ক** নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধক দ্বাদশ ভাগ এবং অভ্র চারি আনা একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া এবং তীব্র আতপে রাখিয়া নবনীতের ন্যায় প্রস্তুত হইলে তাহাকে **রসপিষ্টি** বলা যায়।

অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন গন্ধক ও দুগ্ধের সহিত পারদ খলে মর্দ্দন করিয়া পিষ্টবৎ প্রস্তুত করিলে তাহাই পিষ্টি নামে অভিহিত হয়।

চতুর্থাংশ স্বর্ণের সহিত পারদ মর্দ্দন করিয়া যে পিষ্টি প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে **পাতন পিষ্টি** কহে। ইহা পারদের উত্তম সিদ্ধিপ্রদ।

রৌপ্য বা স্বর্ণ, পারদ ও গন্ধকাদির সহিত মারিত করিয়া তাহা বারংবার উর্দ্ধপাতনে উত্থাপিত করিলে তাহাকে স্বর্ণ বা **রৌপ্যের কৃষ্টী কহে**।

এই কৃষ্টী বা কৃষ্ণী স্বর্ণমধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহা দ্বারা স্বর্ণের বর্ণহানি হয় না। বিশেষতঃ এই স্বর্ণকৃষ্টী পারদের রঞ্জন কার্য্যে বীজ স্বরূপ।

তাম্র ও তীক্ষ্ণ লৌহ বারংবার দ্রবীভূত করিয়া গন্ধক মিশ্রিত মান্দারের রসে নিক্ষেপ করিলে তাহা শ্রেষ্ঠ লৌহরূপে নির্গত হয়। ঐরূপে স্বর্ণের সংস্কার করিলে তাহা **হেমরক্তী** নামে অভিহিত হয়। দ্রবীভূত স্বর্ণে ঐ হেমরক্তি নিক্ষেপ করিলে, স্বর্ণের বর্ণোৎকর্ষ ঘটিয়া থাকে। রৌপ্যেরও এইরূপ সংস্কার করিয়া মনোহর রৌপ্য রক্ত বা বীজ প্রস্তুত

করিতে হয়। ইহার নাম **তাররক্তী**। তাররক্তি রৌপ্যের এবং রৌপ্য রঞ্জক বীজের ও রঞ্জক।

ঘৃত বা বদ্ধ পারদ কিংবা অন্য কোন ধাতুর সহিত কোন ধাতু সংস্কৃত হইয়া যদি শ্বেতবর্ণ হয় তবে তাহা চন্দ্রদল এবং যদি পীতবর্ণ হয় তবে তাহা **অগ্নি দল** নামে অভিহিত হয়।

গ্রন্থান্তরেও এইরূপ বর্ণিত আছে বদ্ধ পারদ অথবা অন্য কোন ধাতুর সহিত কোন ধাতু সংস্কৃত হইয়া শ্বেত বা পীতবর্ণ হইলে তাহা **শ্বেতদল** বা পীতদল নামে কীর্ত্তিত হয়।

স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত তাম্র দশবার পুটপাক করিয়া সেই মারিত তাম্র এবং ঐরূপ বিশোধিত সীসক, উভয়ে চারিপল একত্র মিশ্রিত করিয়া নীলাঞ্জনের সহিত শতবার মারিত করিলে তাহা শুল্বনাগ নামে অভিহিত হয়। ইহা বিশুদ্ধ। এই শুল্বনাগের সহিত সাধিত পারদ একমাস কাল মুখে ধারণ করিলে মনুষ্যদিগের মেহ রোগ সমূহ নিবারিত হয়। পথ্য ভোজী হইয়া এক বৎসরকাল মুখে ধারণ করিলে, বলিও পলিত নষ্ট হয়, গৃধ্রের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি প্রখরা, শরীর পরিপুষ্ট এবং সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

এক ধাতু অপর ধাতুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তৎপরে তাহা দগ্ধ করিয়া দ্রবপদার্থ বিশেষে নির্ব্বাপিত করিলে, যদি তাহা পাণ্ডু পীতবর্ণ হয়, তবে পিঞ্জরী নামে অভিহিত হয়।

রৌপ্য ষোলভাগ ও তাম্র দ্বাদশ ভাগ, একত্র আবর্ত্তিত করিলে, তাহা চন্দ্রার্ক নামে কথিত হয়।

যে কোন একটি সাধ্য ধাতুতে অপর ধাতু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক বাঁক নলের ফুৎকার দ্বারা তাহা দগ্ধ করিলে, বৈদ্যগণ তাহাকে নির্ব্বাহন কহেন। ইহাতে যে ধাতু নির্ব্বাহিত করিতে হইবে, তাহার যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট

থাকে, নির্ব্বাচন দ্রব্য অর্থাৎ যাহা দ্বারা নির্ব্বাপন করিতে হয়, সেই দ্রব্যও তাহার সমপরিমাণে প্রদান করিতে হয়।

যে মৃত ধাতুভস্ম জলে নিক্ষেপ করিলে, তাহাজলের উপরই ভাসিয়া উঠে তাহাকে বারিতর কহে। আর যে ধাতুভস্ম অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা মর্দ্দিত করিলে, অঙ্গুলির রেখা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তাহা রেখা পূর্ণ নামে অভিহিত হয়।

গুড়, গুঞ্জা, সুখস্পর্শ (সোহাগা), মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে ধাতুভস্ম আধ্মাপিত করিলে সে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহাকে অপুনর্ভব ধাতুভস্ম বলা যায়। সেই ধাতুভস্মের উপরে ধান্যাদি গুরুদ্রব্য স্থাপন করিয়া তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে যদি হংসবৎ ভাসিতে থাকে, তবে তাহাকে উনম কহে।

কোন ধাতুভস্মের সহিত রৌপ্য মিশ্রিত করিয়া তাহা আধ্মাপিত করিলে যদি সেই ভস্ম রৌপ্যপাত্রে লাগিয়া যায়, তবে তাহা নিরুথ বা অপুনর্ভব ধাতুভস্ম নামে অভিহিত হয়।

নির্ব্বাপণ দ্রব্য বিশেষের সংশ্রবে ধাতুভস্ম যখন সেই সেই বর্ণ বিশেষ প্রাপ্ত হয় এবং তাহা মৃদু ও বিচিত্র সংস্কার হয়, তখনই তাহা বীজ নামে কীর্ত্তিত হয়। এই বীজ সংস্কারকে বৈদ্যগণ উত্তরণ ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

সংসৃষ্ট ধাতুদ্বয়ের মধ্যে একটি ধাতু বাঁকনলের ফুৎকার দ্বারা দগ্ধ করিলে তাহাকে তাড়ন বলা যায়।

অভ্রের চূর্ণ শালিধান্য ও কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া, বস্ত্রে বন্ধন করিয়া মর্দ্দন করিলে, বস্ত্র মধ্য হইতে যে অভ্রকণা পতিত হবে, তাহাকে ধান্যাভ্র কহে।

ক্ষার অম্ল ও দ্রাবক পদার্থের সহিত ধাতু দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া

কোষ্ঠিকাযন্ত্রে আধ্মাপিত করিলে, যে সার পদার্থ নির্গত হয় তাহারই নাম সত্ত্ব।

কোষ্ঠিকাযন্ত্রে শিখরাকারে কোকিল (কয়লা) পূর্ণ করিয়া, তন্মধ্যে মূষাস্থাপন পূর্ব্বক তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত সেই কয়লাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া আধ্মাপিত করাকে এককোলীসক কহে। কার্য্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন কয়লা ব্যবহার করিতে হয়। যথা—দ্রাবণ ও সত্ত্ব পাতন কার্য্যে মউল কাষ্ঠের ও খদির কাষ্ঠের কয়লা প্রশস্ত। দ্রব পদার্থহীন দ্রব্য আধ্মাপিত করিতে বাঁশের কয়লা উপযোগী। আর স্বেদন কার্য্যে কুল-কাষ্ঠের কয়লা উৎকৃষ্ট।

হিঙ্গুল আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া বিদ্যাধর যন্ত্রদ্বারা তাহা হইতে পারদ আকর্ষণ করিলে সেই পারদকে হিঙ্গুলাকৃষ্ট রস বলা যায়। কাংস্যের সহিত অল্প হরিতাল মিশ্রিত করিয়া বাঁকনলের ফুৎকার দ্বারা তাহা দগ্ধ করিবে। এইরূপে কাংস্যের রঙ্গ ভাগ (দস্তাভাগ) অপগত হইলে অবশিষ্ট তাম্রভাগকে ঘোষাকৃষ্ট কহে।

তীক্ষ্ণলোহ নীলাঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়া তীব্র অগ্নিতে বহুবার আধ্মাপিত করিলে, যখন তাহা কোমল কৃষ্ণবর্ণ ও শীঘ্র দ্রাবণশীল হয়, তখন তাহা বরনাগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মৃত (জারিত) দ্রব্যের পুনরুদ্ভূতি অর্থাৎ পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তিকে উত্থাপন কহে। দ্রব পদার্থে দ্রবীভূত দ্রব্য নিক্ষেপ করাকে ঢালন বলা যায়।

ত্রিশপল পরিমিত সীসক আকন্দের আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া, ক্রমশঃ তাবার পুটপাক করিতে হইবে। পুটপাকে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যখন এক কর্ষ (২ তোলা) মাত্র অবশেষ থাকিবে, তখন পুটপাক বন্দ করিতে হইবে। ইহার পর সহস্রবার পুটপাক করিলেও আর তাহার ক্ষয় হইবে না। বার্ত্তিককারগণ ইহাকে নাগ সম্ভূত চপল বলিয়া থাকেন।

ঐরূপ প্রক্রিয়ায় বঙ্গেরও চপল প্রস্তুত করিতে হয়। সেই চপল হস্তে লইয়া সেই হস্তে পারদ স্পর্শ করিলে, পারদ বদ্ধ হইয়া থাকে। এই পারদ ধাতু ক্রিয়ায় প্রশস্ত, কিন্তু রসায়ন কার্য্যে উপযোগী নহে। আচার্য্য লোকনাথ এই বঙ্গের চপলকে খর্পর নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সীসকের মল জলদ্বারা ধৌত করিয়া, তদ্গত রজঃ প্রভৃতি অপহৃত করিলে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হয়। রসবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে ধৌত নামে অভিহিত করেন।

সম পরিমিত দুইটি ধাতুদ্রব্য একত্র মর্দ্দিত ও আধ্মাপিত করিলে তাহাকে দ্বন্দ্বান কহে। আর সেই দুইটি দ্রব্যের মধ্যে একটী দ্রব্য অপর দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভাগ হইলে, তাহাকে অনুবর্ণ এবং ন্যূন হইলে সুবর্ণক বহে। অন্য কোন পদার্থ দ্বারা বর্ণের হ্রাস ঘটিলে ধাতুবিদ্গণ তাহাকে ভঞ্জনীকহিয়া থাকে।

ধাতু বিশেষে পারদাদির কল্ক দ্বারা রৌপ্য বা স্বর্ণের ন্যায় বর্ণোৎপাদন করিলে তাহা যদি অল্পদিন থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাকে চূল্লকা (গিলটি) কহে, আর যদি সেই রঞ্জিত বর্ণ চিরস্থায়ী হয় এবং দগ্ধ করিলেও নষ্ট হইয়া না যায়, তবে তাহা পতঙ্গী রাগ নামে অভিহিত হয়।

দ্রবীভূত লৌহাদি ধাতুতে যে অন্য দ্রব্যের প্রক্ষেপ দেওয়া যায়, তাহাকে আবাপ, প্রতীবাপ ও আচ্ছাদন কহে।

কোন ধাতু অগ্নিতাপে দ্রবীভূত করিয়া অষ্টনিমেষ কাল অপেক্ষা পূর্ব্বক তাহাতে অল্প অল্প করিয়া জল নিক্ষেপ করিলে, তাহাকে অভিষেক বলা যায়। উত্তপ্ত ধাতুজলে নিক্ষেপ করিলে, তাহাকে অভিষেক বলা যায়। উত্তপ্ত ধাতুজলে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে নির্ব্বাপন ও স্বপন কহে।

ধাতু দ্রবীভূত হইয়া যখন নির্ম্মল হয়, তখনই তাহাতে প্রতীবাপাদি অর্থাৎ অপর দ্রব্যের প্রক্ষেপাদি করিবে। ধাতু পদার্থ আধ্মাপিত

করিবার সময় যখন তাহা হইতে শুভ্রবর্ণ অগ্নিশিখা নির্গত হয় তখন তাহাকে শুদ্ধাবর্ত্ত কহে। তাহাই সত্ত্ব নির্গমের কাল। আর যখন আধ্মাপন কালে দ্রবীভূত দ্রব্যের ন্যায় শিখা নির্গত হয় এবং দ্রব পদার্থে উন্নত হইয়া (উথলিয়া) উঠে তখন তাহা বীজাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যে কোন পদার্থ অগ্নিতে জ্বাল দেওয়ার পর সেই অগ্নিতে থাকিয়াই ক্রমশঃ আপনা হইতে শীতল হইয়া যায় তাহাকে স্বাঙ্গশীতল কহে। সেই দ্রব্য অগ্নির উপর হইতে নামাইয়া লওয়ার পর শীতল হইলে তাহাকে বহিঃশীতল বলা যায়।

ক্ষার, অম্ল বা অপর কোন ঔষধের সহিত কোন দ্রব্য দোলাযন্ত্রে পাক করিলে তাহাকে স্বেদন কহে। মর্দ্দন দ্বারা সেই পদার্থের বহির্গত মল বিনষ্ট হয়।

নির্দ্দিষ্ট ঔষধ অথবা অম্ল পদার্থ কিংবা কাঁজির সহিত কোন দ্রব্য পেষণ করিলে তাহাকে মর্দ্দন কহে। মর্দ্দন দ্বারা সেই পদার্থের বহির্গত মল বিনষ্ট হয়।

যথানির্দ্দিষ্ট ঔষধের সহিত মর্দ্দন করিয়া কোন দ্রব্যকে নষ্ট পিষ্ট করিলে তাহাকে মূর্চ্ছন বলা যায়। মূর্চ্ছন ক্রিয়া দ্বারা বঙ্গাদি দ্রব্যান্তর সংযোগ ও কঞ্চুকাদি দোষ নিবারিত হয়।

স্বেদ ও আতপাদির যোগে ভস্মীভূত ধাতুর পুনর্ব্বার স্বাভাবিক অবস্থা উৎপাদন করাকে উত্থাপন ক্রিয়া কহে। ইহা দ্বারা মূর্চ্ছন ক্রিয়া জনিত ব্যাপত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পারদাদির স্বরূপ বিনষ্ট হইয়া তাহা পিষ্টাকারে পরিণত হইলে তাহা বন্ধন ক্রিয়া নামে অভিহিত হয়। এইরূপ নির্জ্জিত পারদকে পণ্ডিতগণ নষ্টপিষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন!

যথানির্দ্দিষ্ট ঔষধের সহিত মর্দ্দিত পারদ যথাযথ যন্ত্রে নিহিত করিয়া ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যক ভাবে পাতিত করিয়া নির্ব্বাপিত করার নাম পাতন ক্রিয়া। ইহাদ্বারা বঙ্গ ও সীসক সংসর্গ জনিত কঞ্চুক দোষ বিনষ্ট হয়।

জল ও সৈন্ধব লবণের সহিত পারদ সংযুক্ত করিয়া তিন দিন একটি কলসী মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিলে, তাহাকে আস্থাপনী ও রোধন ক্রিয়া কহে।

এইরূপ রোধন ক্রিয়া দ্বারা পারদ লব্ধবীর্য্য হইলে, তাহার চপলতা দোষ বৃদ্ধি পায়; সেই চপলতা নিবৃত্তির জন্য যে স্বেদ ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাকে নিয়ামন কহে।

ধাতু পাষাণ ও মূলাদি ঔষধের সহিত (পারদ) সংযুক্ত করিয়া তাহা ঘটমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক তিনদিন গ্রাসার্থ যে স্বেদ দেওয়া যায় পণ্ডিতগণ তাহাকে দীপন কহে।

এই পরিমিত পারদ এই পরিমিত দ্রব্য গ্রাস করিতে পারিবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পারদের এবং গ্রাসার্থ দ্রব্যের যে পরিমাণ নিশ্চয় করা হয়, তাহাকে গ্রাসমান বলা যায়।

প্রসিদ্ধ বার্ত্তিকারগণ জারণ ক্রিয়া তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন যথা—গ্রাসচারণ, গর্ভদ্রাবণ ও জারণ। তন্মধ্যে গ্রাসচারণ, তিন প্রকার, যথা—গ্রাস, পিণ্ড ও পরিণাম। আর জারণ ক্রিয়া সমুখা ও নির্ম্মুখা ভেদে দুই প্রকার। যে জারণ ক্রিয়ায় নির্দ্দিষ্ট ভাগ পরিমিত বীজ গৃহীত হয়, তাহাকে নির্ম্মুখা জারণ কহে। শোধিত স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দুইটী ধাতুকে বীজ বলা যায়। চতুঃষষ্টি অংশ পরিমিত বীজ প্রক্ষেপের নাম মুখ, সেই মুখের সহিত জারণ করা হইলে পারদ গ্রাস লোলুপ মুখবান হয়, অর্থাৎ কঠিন ধাতু সমূহকেও গ্রাস করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বনবাসী সিদ্ধ পুরুষগণ ইহাকেই সমুখা জারণা বলেন।

মনঃশিলা মিশ্রিত পারদ, কোষ্ঠিকাযন্ত্রে আধ্মাত হইবার সময় যদি সমস্ত ধাতুই গ্রাস করিতে সমর্থ হয় তবে সেই পারদ রাক্ষসবক্ত্র নামে পরিচিত হয়।

পারদগর্ভে গ্রাসোপযোগী পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ সেই পদার্থ পারদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেলে তাহাকেই গ্রাসচারণ কহে। গ্রস্ত পদার্থ পারদগর্ভে দ্রবীভূত হইলে তাহাকে গর্ভদ্রুতি বা গর্ভ দ্রাবণ বলা যায়।

পারদ জারণকালে ঘন সত্ত্বাদি পদার্থ যদি বাহিরেই অর্থাৎ পারদের সহিত মিশ্রিত না হইয়াই দ্রবীভূত হইয়া যায়, তবে তাহাকে বাহ্যদ্রুতি কহে।

নির্লেপত্ব, দ্রুতত্ব, তেজস্ব, লঘুতাও পারদের সহিত অসংযোগ এই পাঁচপ্রকার দ্রুতি লক্ষণ। পারদ আধ্মাপিত করিবার সময় যদি ঔষধ অথবা লৌহাদি ধাতু দ্রবীভূত অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তবে তাহাও দ্রুতি নামে কীর্ত্তিত হয়।

বিড় এবং যন্ত্রাদি যোগে দ্রুতি, ত্রাস, পরিণাম প্রভৃতি যে সকল সংস্কার হইয়া থাকে, সেই সমস্তেরই নাম জারণ। জারণ ক্রিয়ার কোটি কোটি প্রকার ভেদ আছে।

রসগ্রাস কালে জীর্ণার্থ ক্ষার, অম্ল, গন্ধাদি পদার্থ, মূত্র ও লবণাদি যে সকল পদার্থ প্রদত্ত হয়, তাহাকে বিড় কহে।

সুসিদ্ধ বীজ ধাতু প্রভৃতির সহিত রসের জারণ দ্বারা যে পীতাদি বর্ণের উৎপত্তি হয় তাহাকে রঞ্জন কহে।

তৈলযুক্ত যন্ত্রমধ্যে পারদ রাখিয়া তাহাতে স্বর্ণাদি নিক্ষেপ করিলে তাহাকে সারণা কহে। ইহা ধাতু সংস্কার বিষয়ে বেধকর্ম্ম অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকর।

ব্যবায়ী (যাহা জীর্ণ না হইয়াই ক্রিয়া প্রকাশ করে) ঔষধ সমূহের

সহিত পারদ মিশ্রিত করিলে বেধ নামে অভিহিত হয়। লেপ, ক্ষেপ, কুন্ত, ধূম ও শব্দ নামভেদে বেধক্রিয়া বহুবিধ।

পারদ বিশেষ লৌহে প্রলিপ্ত করিয়া, যে স্বর্ণ বা রৌপ্য উৎপাদন করা হয়, তাহাকে লেপবেধ কহে। উহাতে যেরূপ পুটপাক করিতে হয়, তাহা অনায়াস সাধ্য। দ্রবীভূত লৌহে পারদ বিশেষ প্রক্ষেপ দিয়া যে স্বর্ণাদি প্রস্তুত করা হয়; তাহাকে ক্ষেপবেধ কহে।

একটি সন্দংশে (সন্নায়) পারদ বিশেষ ধারণ পূর্ব্বক সেই সন্দংশে দ্রবীভূত লৌহাদি গ্রহণ করিয়া স্বর্ণাদি প্রস্তুত করিলে তাহাকে কুন্তবেধ কহে।

অগ্নিমধ্যে কোন ধাতু নিহিত করিয়া সেই অগ্নিতে পারদ নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে ধূম নির্গমের সঙ্গে সঙ্গে যে স্বর্ণাদি প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধূমবেধ বলা হয়।

মুখমধ্যে পারদ বিশেষ ধারণ করিয়া অল্প পরিমিত ধাতুতে সেই মুখের ফুৎকার পূর্ব্বক যে স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহা শব্দবেধ নামে অভিহিত হয়।

পারদ সংমিশ্রণ দ্বারা প্রসিদ্ধ ঔষধ সমূহের মলিনতাদির নিবারণ করিয়া স্বাভাবিক বর্ণের প্রকাশ করিলে তাহা উদ্ঘাটন নামে কীর্ত্তিত হয়।

ক্ষার ও অম্ল ঔষধের সহিত অতি যত্নপূর্ব্বক ভাণ্ডমধ্যে পারদ নিহিত করিয়া তাহা ভূমি মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাকে স্বেদন ক্রিয়া বলে।

ঔষধ সংযুক্ত পারদ ভাণ্ডমধ্যে রুদ্ধ করিয়া মন্দাগ্নিপূর্ণ চুল্লীর মধ্যে নিহিত করাকে সন্ন্যাস কহে।

স্বেদন ও সন্ন্যাস এই দুইটি ক্রিয়া পারদের গুণোৎকর্ষজনক এবং শীঘ্র ব্যাপ্তিকারক।

রসসেবনের মাত্রা

ঔষধ সেবনের মাত্রার কোন স্থিরতা নাই। রসসিদ্ধ পণ্ডিতগণ প্রত্যেকেই রসসেবন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রোগীর বয়স, বল ও শারীরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসক ঔষধের মাত্রা নির্দ্দেশ করিবেন। চিকিৎসকগণের সুবিধার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত রসসেবন মাত্রা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পারদভস্মের মাত্রা প্রতিদিন ১ রতি, স্বর্ণভস্মের মাত্রা ১ রতি, রৌপ্য ভস্মের ৩ রতি, তাম্রভস্ম, লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম, সীসকভস্ম, বঙ্গভস্ম, পিত্তল ও কাংস্য ভস্ম প্রতিদিন ২ রতি, মুক্তাভস্মের মাত্রা ২ যব হরিতাল ভস্মের মাত্রা ১ সর্ষপ হইতে সিকি রতি।

রসসেবনের নিয়ম

যে সকল রস মৎস্যাদির পিত্ত দ্বারা ভাবিত, সেই সকল রস সেবনের পর জল সেচন ও অবগাহন ক্রিয়া করিলে ঔষধের বলবর্দ্ধিত হয়। রস সেবনে বিদাহ উপস্থিত হইলে গাত্রে শীতল জলাভিষেক, চন্দনাদির অনুলেপন, মন্দ মন্দ বায়ু সেবন, শর্করা সংযুক্ত টাট্কা দধি সেবন, ডাবের জল পান, মধুর ও শীতল পানীয় এবং অন্যান্য শীত ক্রিয়া হিতকর।

রসেন্দ্রবেধজ স্বর্ণ প্রস্তুত বিধি

(১) গন্ধক, হিঙ্গুল, লৌহচূর্ণ ও মনঃশিলাকে তিনদিন অম্লরসে মর্দ্দন করিবে। তাহারপর তাহাদিগকে একটি সুদৃঢ় লৌহ কটাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে ঐ চূর্ণ একটি কাঁচ কূপীতে পূর্ণ করিয়া ৯ ঘণ্টা বালুকা যন্ত্রে তীব্রাগ্নিতে পাক করিবে। ইত্যবসরে অপর একটি মূষায় কিঞ্চিৎ রৌপ্য গালিত করিবে। তাহার পর উক্ত বালুকা যন্ত্র হইতে উত্তপ্ত অবস্থায় ঐ মিশ্রিত দ্রব্যগুলি কতক বাহির করিয়া গালিত রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত করিবে। তাহা হইলে [illegible]

দেখিবে যে ঐ মিশ্রিত দ্রব্যের সমপরিমিত রৌপ্য স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে। এই স্বর্ণের অর্দ্ধেক অংশ বাজারে বিক্রীত বিশুদ্ধ স্বর্ণের তুল্য।

(২) তাম্রকে হিঙ্গুলের সহিত তিনবার জারিত করিয়া তিন বার পুনর্জ্জীবিত করিবে। তাহা হইলে তাম্র বিশুদ্ধ, পীত, ও অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট হইবে। তাহার পর উক্ত তাম্রকে খর্পর পাত্রে ত্রিফলার জলে ভাবনা দিয়া সেহুণ্ডের আঠায় মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঐ তাম্রকে তীব্র অগ্নিতে মুষা মধ্যে উত্তপ্ত করিলে উহা রাজভোগ্য বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত হইবে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ বৃদ্ধি করণ

তুতে /০, রসক ভস্ম /০, মনঃশিলা ৵০, একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা নিকৃষ্ট স্বর্ণের সহিত গলাইলে উহার বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়।

রৌপ্য প্রস্তুত বিধি

(১) ১২ ভাগ তীক্ষ্ম লৌহচুর্ণ, ৩ ভাগ বঙ্গচূর্ণ, ৩ ভাগ সীসকচুর্ণ, ৩ ভাগ হরিতাল চূর্ণ, কাঁটা নটের রস ও সোহাগা চুর্ণের সহিত ১ দিন অন্ধ মূষায় পাক করিবে। পাক শেষে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য সমপরিমিত রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে মিশ্রিত দ্রব্য বিশুদ্ধ রৌপ্য পরিণত হয়।

(২) ছয় পল শোধিত চুর্ণীকৃত হরিতাল, ২ পল ভূনাগ স্বত্ব ১ পল সোহাগা, একত্রে কদলী ও ওলের রসে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া একটী বোতলে তিনদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবে তাহার পর স্বত্বপাতন করিবে। উক্ত আবদ্ধ দ্রব্যের সত্ত্বের ১৬ গুণ তাম্র উহার সহিত মিশ্রিত হইলে উহা বিশুদ্ধ রৌপ্যে পরিণত হয়।

মল্লিখিত "ভারতীয় রসবিদ্যা" নামক গ্রন্থে এই বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

রসশালা নির্ম্মাণ

মহানগরীর মধ্যস্থিত চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত বাধাবিঘ্ন বিবর্জ্জিত স্থানে রসশালার নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। ইহার মনোরম উদ্যানটি সর্ব্বপ্রকার ওষধি সমন্বিত এবং স্বচ্ছতোয় কূপবিশিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। এখানে উপযুক্ত সময়ে শিবদুর্গার পুজার্চ্চনা হওয়া উচিত। প্রাকারটি এরূপভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে যেন তস্করাদি দুর্বৃত্তেরা ইহার কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে। এই রসশালায় উপযুক্ত সংখ্যায় দ্বার এবং গবাক্ষ থাকিবে। এইরূপ রসশালাতে বিজ্ঞ চিকিৎসক অতিনির্জ্জনে শান্ত মনে রসক্রিয়া সমাধান করিবেন।

রসশালার পূর্ব্বদিকে গবাক্ষের সন্নিকটে রবিরশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত স্থানে স্ফটিক পাথরের ন্যায় সমুজ্জল সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত মৃত্তিকার বেদী রচনা পূর্ব্বক উহাতে, রসলিঙ্গ স্থাপন করিয়া রসজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রীয় মতে উহার পূজা করিবেন।

রসশালার অগ্নিকোণে অগ্নিকার্য্য, দক্ষিণে পাষাণ কার্য্য, নৈঋতে শস্ত্রকার্য্য, পশ্চিমে প্রক্ষালণ কার্য্য, বায়ুকোণে শোষণ কার্য্য, উত্তরে বেধকর্ম্ম এবং ঈশান কোণে সিদ্ধ বস্তু সমূহ স্থাপন করিবে। রসশালার মধ্যভাগ রসসাধনার দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ রাখিতে হইবে।

রসশালার উপকরণ

সত্ত্বপাতন কোষ্ঠী, সুশোভন ঝরৎ কোষ্ঠী, ভূমি কোষ্ঠী, চলৎ কোষ্ঠী প্রভৃতি কোষ্ঠিকা যন্ত্র, নানাপ্রকার জলদ্রোণী (গামলা), দুইটি হাপর, বংশ নির্ম্মিত ও লৌহনির্ম্মিত দুইটী নল, স্বর্ণ, লৌহ, কাংস্য, তাম্র ও প্রস্তরের কুন্ড, চর্ম্মকারগণের নানাবিধ যন্ত্রাদি পদার্থ, উদূখল, পেষণী (শিল), দ্রোণীবৎ খল, বর্ত্তুলাকৃতি খল, লৌহময় খল, তপ্ত খল, ও তদুপ-যোগী মর্দ্দক (নোড়ী) সকল, ছাঁকিবার জন্য সূক্ষ্ম চালনী, কষায়িত চর্ম্মখণ্ড, শলাকা ও কণ্ডনী দ্রব্য সমূহ। এই গুলি রসশালার উপকরণ।

মুষা (মৃত্তিকার সরা), মৃত্তিকা, তুষ,কার্পাস, বনঘুঁটে, পিষ্টক, ধাতুময় মূলময় এবং জীবময় ঔষধ, শিখিত্র (জ্বলন্ত অঙ্গার), গোবর, শর্করা ও সিতোপলা এই সমস্ত দ্রব্যও রসশালায় রাখিতে হইবে। কাচ, লৌহ মৃত্তিকা এবং কড়ি নির্ম্মিত বোতল এবং পানপাত্র সংগ্রহ রাখিতে হইবে। কুলা প্রভৃতি বংশ নির্ম্মিত দ্রব্য, খুন্তি, ক্ষিপ্র, শঙ্কিকা (লৌহদণ্ড) ক্ষুরপ্র (লৌহের হাতা), পাক্য, পালিকা কর্ণিকা (কুর্ণি), শাকচ্ছেদন শস্ত্র, গৃহ সমার্জ্জনী এবং রসপাকের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্য ও সংগ্রহ রাখিতে হইবে।

[জ্বলন্ত অঙ্গারকে শিখিত্র এবং অঙ্গারে জল না দিয়া নির্ব্বাপিত করিলে তাহাকে কোকিল (কয়লা) বলে। শুষ্ক গোময়ের নাম পিষ্টক।

আচার্য্য লক্ষণ।

রসশাস্ত্রজ্ঞ, নিঘণ্টুজ্ঞ (আভিধানিক) ও সর্ব্বদেশের ভাষাবিদ্ বার্ত্তিক বৈদ্যগণকে রসপাক কালে সাধকের সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাঁহারা রসপাকের অবসান পর্য্যন্ত নিয়ত কাল অঘোর মন্ত্রজপ করিবেন। রসকার্য্য সাধনার্থ উদ্যমশীল, শুচি, শৌর্য্যশালী ও বলিষ্ঠ পরিচারক নিযুক্ত করিতে হইবে। ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, বিদ্বান, শিব-বিষ্ণু পূজক, দয়াবান ও পদ্মচিহ্ন বিশিষ্ট বৈদ্যকে রসপাকার্থ নিযুক্ত করিবে; যাঁহার হস্তে পতাকা, কুম্ভ, পদ্ম, মৎস্য ও ধনুর চিহ্ন অঙ্কিত থাকে এবং অনামিকার অধোভাগ পর্য্যন্ত উর্দ্ধ রেখা অঙ্কিত দেখা যায়, সেই বৈদ্যকে অমৃত হস্তবান কহে। অমৃত হস্ত বৈদ্য রসকার্য্য সাধনে অধিক প্রশস্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুলক্ষণাক্রান্ত বৈদ্য রসক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। আর যে বৈদ্যভাগ্যহীন, নির্দ্দয়, লুব্ধ গুরু বর্জ্জিত ও হস্তে কৃষ্ণবর্ণ রেখাযুক্ত, তাহাহাকে দগ্ধ হস্ত বলাযায়, এরূপ বৈদ্য রসক্রিয়া সাধনে পরিত্যজ্য।

ভূত নিবারক মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিধিসাধন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। বলবান্ সত্যবাদী, রক্তনেত্র, কৃষ্ণমূর্ত্তি ও ভূতগণের ভয়োৎপাদক, বিদ্যাশালী ব্যক্তিগণকে বলিসাধনার্থ নিযুক্ত করিবে। লোভহীন, সত্যবাদী, দেব ব্রাহ্মণ পূজক, সংযমী ও পথ্য ভোক্তা ব্যক্তি দিগকে রসায়ন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ধনবান, বদান্য, সর্ব্বউপকরণবান্ ও গুরুবাক্যরত ব্যক্তি ধাতুসাধনে প্রশস্ত। আর ঔষধ আহরণের জন্য, সকল ঔষধের নামজ্ঞ, শুচি, বঞ্চনাহীন ও নানাবিষয়, ও ভাষাজ্ঞান শালী ব্যক্তিই উপযুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়।

শুচি, সত্যবাদী, আস্তিক, বুদ্ধিমান্ ও নিঃসংশয় চিত্ত ব্যক্তির রসক্রিয়া সর্ব্বদাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যে সাধক পারদের অষ্টাদশ সংস্কার সুসিদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাকেই রসসিদ্ধ বলা যায়। রসসিদ্ধ মানব দাতা ভোগী, অযাচক, জরামুক্ত, জগৎপূজ্য, দিব্যকান্তি ও নিত্যসুখী হইয়া থাকে।

রাজবৈদ্যের লক্ষণ।

যিনি সমগ্র রস শাস্ত্র সম্যগ্ রূপে অধ্যয়ন করিয়া পারদের অষ্টাদশ সংস্কার, যাবতীয় রস, উপরস, ধাতু, উপধাতু, রত্ন, উপরত্ন, বিষ, উপবিষ প্রভৃতি রস চিকিৎসার উপকরণ সকলের শোধন, জারণ, মারণ, ভস্মীকরণ দ্রাবণ ও স্বত্বপাতনাদি কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া উহাদের প্রয়োগ দ্বারা রোগাক্রান্ত জনগণের রোগ মুক্ত করিতে সমর্থ তিনিই যথার্থ রাজবৈদ্যপদবাচ্য।

রসসিদ্ধ।

(১) নন্দিরাজ, (২) শুক্রাচার্য্য (৩) আদিম (৪) চন্দ্রসেন (৫) রাবণ, (৬) রামচন্দ্র (৭) কপালী (৮) মত্ত (৯) মাণ্ডব্য, (১০) ভাস্কর (১১) সুরসেন (১২) রত্নকোষ (১৩) শম্ভু (১৪) সাত্ত্বিক (১৫) নরবাহন (১৬) ইন্দ্রদ (১৭) গোমুখ (১৮) কাম্বলী (১৯) ব্যাড়ি (২০) [illegible]

(২২) সোমদেব (২৩) নাগার্জ্জুন (২৪) স্বরানন্দ (২৫) নাগবোধী (২৬) যশোধ (২৭) খণ্ড (২৮) কাপালিক (২৯) ব্রহ্মা, (৩০) গোবিন্দ (৩১) লম্বক (৩২) হরি (৩৩) মন্থানভৈরব (৩৪) নৃত্যনাথ (৩৫) বাগভট্ (৩৬) অনন্তদেব (৩৭) ভূদেব (৩৮) প্রভাকর। ইহারা সকলেই রসসিদ্ধ অর্থাৎ ইহারা রসের সকল প্রকার সংস্কার বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।

মকরধ্বজ পাক বিধি।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের মহৌষধ। বর্ত্তমান সময়ে ইহা প্রকৃতভাবে প্রস্তুত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় এবং সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদে যে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনটীতেও প্রকৃত পাকবিধি লিখিত হয় নাই। অধিকাংশ চিকিৎসাব্যবসায়ী ইচ্ছাসত্ত্বেও পাকবিধির অজ্ঞতাহেতু উহা পাক করিতে কৃতকার্য্য হন না। মকরধ্বজ পাকশিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য নিম্নে রসসিন্ধু ও মকরধ্বজের পাকবিধি লিখিত হইল।

রসসিন্দূর পাক বিধি।

মকরধ্বজ প্রস্তুতের বোতলের তলদেশ সমতল হওয়া আবশ্যক। বাজারে সচরাচর যাহাকে গেঁটে বোতল কহে তদ্রূপ বোতলই মকরধ্বজ পাকে প্রশস্ত। অনেক বোতলের তলদেশ সমান নহে কুব্জভাবে উত্থিত। এতাদৃশ বোতলে রসসিন্দুর পাক করা উচিৎ নহে। যে বোতলের গলদেশ তীর্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত হইয়া মুখনলের সহিত মিলিত হয় তাদৃশ বোতল মকরধ্বজ পাকের উপযোগী নহে। এবং যে বোতলের গলদেশ সরল রেখা ক্রমে উত্থিত হইয়া মুখনলের সহিত মিলিত হইয়াছে সেইরূপ বোতল মকরধ্বজ পাকের উপযোগী। মোটের উপর বোতলটি যেন বেশ দৃঢ় হয়। তাহার পর ঐ বোতলে মৃত্তিকার প্রলেপ দিতে হইবে। মৃত্তিকা যেন বেশ আঁঠাল হয়। অল্প পরিমাণে তুষ ও পাটের কুচির

সহিত মৃত্তিকাকে সুন্দররূপে মর্দ্দিত করিতে হইবে। বোতলের তলদেশে সামান্য প্রলেপ দিয়া উহার সর্ব্বাঙ্গে দুই আঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। ঐ প্রলেপের উপর সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহার উপর পুনরায় প্রলেপ দিবে। বোতলের গলার ও গলদেশের সন্ধিস্থলে পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। প্রলেপ দেওয়া শেষ হইলে প্রলেপটিকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ঐ সময়ে যদি প্রলেপ ফাটিয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় অল্প মৃত্তিকা দ্বারা ঐ ফাটলগুলি পূর্ণ করিয়া দিবে। পারদ ও গন্ধকের সুসিদ্ধ কজ্জলী এইরূপ মৃত্তিকালিপ্ত বোতলে রাখিবে। ইহার পর একখানি খড়ির দ্বারা ছিপি প্রস্তুত উহার মুখে লাগাইবে। ছিপিটি এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন বোতলের মুখে কিছুমাত্র ফাঁক না থাকে। তাহার পরে এরূপ একটি হাঁড়ি গ্রহণ করিবে যাহার মধ্যে বোতলটি রাখিলে ঐ বোতলের চারি পার্শ্বে অন্ততঃ চারি অঙ্গুলি ফাঁক থাকে। অতঃপর ঐ হাঁড়িটির তলদেশের ঠিক মধ্যস্থলে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে পারে এরূপ একটি গোলাকার ছিদ্র করিবে ঐ কর্দ্দমলিপ্ত বোতলটী ছিদ্রের উপর বসাইয়া হাঁড়িটী সুশুষ্ক বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে। এই যন্ত্রের নাম বালুকা-যন্ত্র। তাহার পর এই বালুকাযন্ত্রটী চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া কাষ্ঠাগ্নিতে মৃদু জ্বালে পাক করিবে এবং কজ্জলী দ্রবীভূত হইলে জ্বালের মাত্রাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ছিপিটি খুলিলে কজ্জলী দ্রবীভূত হইয়াছে কি না দেখিতে পাইবে। কজ্জলী উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছিপির পার্শ্ব দিয়া অল্প অল্প বাহির হইতে থাকিলে একটি লৌহনির্ম্মিত শালাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দারা উক্ত বোতলের গলদেশে সঞ্চিত দ্রবীভূত অংশ মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিয়া ছিপিটী শক্ত করিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে যখন দেখিবে যে বোতলের তলদেশ প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়াছে তখনি একটি পরিষ্কার শীতল লোহার শালকা বোতলের তলদেশ পর্য্যন্ত দিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া উঠাইয়া দেখিবে যে উহার তলদেশে কালি ধরিয়াছে কিনা যদি শলাকায় কালি ধরিয়া থাকে তবে আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিবে। এই সময়ে জ্বালের পরিমাণ কিছু মৃদু হওয়া উচিত। তাহার পর পুনরার উক্ত শীতল শলাকাটিকে বোতলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া উঠাইয়া দেখিবে যে উহার প্রান্তদেশে ছাই লাগিয়াছে কি না। উক্ত ছাই-এর রঙ যদি সাদা হয়

তাহা হইলে আর জ্বাল দিবে না। ইহার পর যন্ত্রটীকে নামাইয়া যাবৎ সুশীতল না হয় তাবৎ রাখিয়া দিবে। পাত্রটি শীতল হইলে বোতলটি বাহির করিয়া ভাঙ্গিবে এবং উহার ঊর্দ্ধ্ব সংলগ্ন বালার্কসদৃশ রসসিন্দুর গ্রহণ করিবে। সাধারণতঃ ১২ ঘণ্টা জ্বাল দিলে রসসিন্দুর প্রস্তুত হয়।

মকরধ্বজ পাক বিধি।

মকরধ্বজ পাক-বিধি রসসিন্দুর পাকের ন্যায়। কিন্তু রসসিন্দুর অপেক্ষা মকরধ্বজ পাক দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। ইহা পাক করিতে অন্ততঃ তিনদিন সময় ক্ষেপণ আবশ্যক। ইহার পাক প্রথমে মৃদু জ্বালে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জ্বালের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া পাকের শেষ অবস্থায় জ্বাল পুনরায় মৃদু করিতে হয়।

মকরধ্বজের কজ্জলী।

গ্রাসন শক্তিবিশিষ্ট পারদ, স্বর্ণের নিরুত্থ ভস্ম ও শোধিত গন্ধক একত্রে প্রস্তর খলে নিক্ষেপ করিয়া মাড়িয়া কজ্জল সদৃশ মসৃণ করিয়া উহার সহিত ঘৃতকুমারীর রস মিশ্রিত করিয়া পুনরায় মর্দ্দন করিবে উহা তাহার পর শুষ্ক করিয়া বোতল মধ্যে পুরিবে।

স্বর্ণ-ভস্মের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ স্বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতও কজ্জলী প্রস্তুত কালে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, সীসক, দস্তা, বঙ্গ

পিতল ও কাংসর ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া মতে বিশুদ্ধ করিবে। তাহার পর উখা দ্বারা ঘসিয়া উহাদের চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ধাতুসকলের খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ পাওয়া যায়। উক্ত চূর্ণ সকলকে ১ দিন ত্রিফলার ক্বাথে ভাবনা দিয়া লইয়া শুষ্ক করিবে। তাহার পর স্বর্ণ ভস্মের ৪র্থ বিধি অনুসারে উহাদের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া ১ বার গজপুটে পাক করিলেই উহাদের অতি বিশুদ্ধ নিরুত্থ ভস্ম প্রস্তুত হইবে।

ইতি রসচিকিৎসা নামক মহাগ্রন্থের প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।